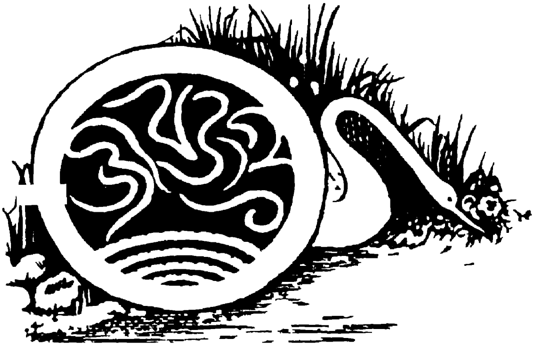


ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক,

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক,

ও

"গাছপালার গল্প" ও "প্রকৃতির কথা"

প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

প্রণীত

১৩৩৮

আশুতোষ লাইব্রেরী,

৫ন কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা

কলিকাতা

৫নং কলেজ স্কোয়ার

শ্রীনারসিংহ প্রেসে

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

উৎসর্গ পত্র।

অগ্রগামী প্রিয়তম অনুজ

৺কুমুদকুমার ভট্টাচার্য্য এম. এ., বি. এল., এর

পবিত্র আত্মার তৃপ্তির জন্য

"জীবজগৎ"

উৎসর্গ করিলাম।

ময়মনসিংহ,
মংলিয়া,
সন ১৩৩৭ সাল।

তা'র পরিত্যক্ত
ছোড়্‌'দা

ভূমিকা

তরলমতি শিশুগণ যাহাতে শৈশবেই জীবজগতের সহিত পরিচিত হইতে পারে তাহার জন্য এই পুস্তকখানা লিখিত হইল। প্রাণী জগতে যে সকল প্রাণী আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে অনাবিষ্কৃত প্রাণীর সংখ্যা যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তারপর পরিচিত প্রাণীর মধ্যেও সকল প্রাণীর জীবন বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারা গিয়াছে একথা এখনও বলা চলে না। যতটুকু জানা গিয়াছে নূতন প্রাণী আবিষ্কারের সঙ্গে কিংবা অনুসন্ধানের ফলে তাহারও হয়ত কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। জীবজগতের এরূপ অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়া, কেন যে আমি শিশুদিগের জন্য এই পুস্তক প্রণয়নে সাহস করিয়াছি, সুধীগণের নিকট তাহার কৈফিয়ৎস্বরূপ প্রথমতঃ বলিতে চাই যে, জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অনুসন্ধানের ফলে, জীবজগৎ সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা বড়ই রহস্যপূর্ণ এবং আশ্চর্য্যজনক, তাহা জানিতে পারিলে আমাদের শিশুগণ নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবে। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়ে তাহাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হইলে, যদি কোন নূতনত্ব কিংবা ভুল অতঃপর আবিষ্কৃত হয়, তখন তাহারা সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবে এবং আবশ্যক হইলে সংশোধনও করিতে পারিবে। অন্যান্য প্রত্যেক সভ্যদেশের শিক্ষক ও অভিভাবকগণ, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদিগকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়ার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহারা অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তাহারও পূর্ব্বে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অনেক কথাই শিখিয়া থাকে। আমাদের শিশুগণও যাহাতে শিক্ষার সেই সুবিধা এবং সুযোগ অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যই আমার এই চেষ্টা। শুধু কতকগুলি প্রাণীর জীবনী না লিখিয়া, আমি এই পুস্তক বৈজ্ঞানিক নিয়মানুযায়ী জীবজগতের ধারাবাহিক বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে, পরিচিত প্রাণীর জীবনী সাধ্যমত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে জীবজগতের বৈচিত্র্যের দিকে শিশুদিগের মনোযোগ যেমন আকর্ষণ করা হইয়াছে, তেমনি আবার জীবজগতে ক্রম-বিবর্ত্তণের ধারা, যাহাতে তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারে তাহার প্রতিও লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমার এই প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হইয়াছে তাহা সুধীগণই বিচার করিবেন।

বঙ্গভাষায় আজ পর্য্যন্ত প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল পরিভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ পুস্তক প্রণয়ন পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে, একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেক স্থলেই প্রচলিত পরিভাষার অভাবে আমি নূতন পরিভাষা সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই সকল পরিভাষার সঙ্গে সঙ্গে, সমার্থবোধক ইংরেজী শব্দগুলি দেওয়া আছে। সকল পরিভাষারই প্রকৃত অর্থ রক্ষা করিয়া, শ্রুতিমধুর করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। যেখানে নূতন পরিভাষা ইংরেজী শব্দ হইতেও কঠিন আকার ধারণ করে, সেখানে ইংরেজী শব্দই রাখা হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়ে শিশুদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য পরিচিত প্রাণীর উদাহরণ দেওয়ার সুবিধা পাইলে, প্রথমেই তাহা উল্লেখ করিয়া অপরিচিত উদাহরণ পরে উল্লেখ করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত এবং অপরিচিত প্রায় সকল প্রাণীরই ছবি বইয়ের স্থানে স্থানে দেওয়া হইয়াছে।

এই পুস্তক প্রণয়ন জন্য আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও কৃতবিদ্য ছাত্রগণের নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ এবং সাহায্য লাভ করিয়াছি; এজন্য আমি তাহাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ময়মনসিংহ,
মহালয়া,
সন ১৩৩৭ সন।

নিবেদক—
বিনীত গ্রন্থকার।

সূচী

মেরুদণ্ডী প্রাণী

চিত্রসূচী



জীবজগৎ

সূচনা

হে তরুণ পাঠক-পাঠিকাগণ! তোমরা সকলেই রূপকথার অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্যজনক গল্প শুনিয়াছ। সেই গল্প শুনিবার জন্য তোমাদের যে কতটা আগ্রহ তাহা তোমরা নিজেরাই বেশ জান। আবার যে গল্প যত বেশী আশ্চর্য্যজনক, তাহাই তোমাদের তত বেশী প্রিয় হইয়া থাকে। এই রূপকথারই মত আশ্চর্য্যজনক গল্প আজ তোমাদিগের নিকট বলা হইবে। কিন্তু এই গল্পের একটু বিশেষত্ব এই যে, গল্পগুলি অদ্ভুত এবং বিস্ময়জনক হইলেও, রূপকথার মত মোটেই মিথ্যা নহে, বরং সম্পূর্ণ সত্য। তোমরা নিজেরাই পরীক্ষা করিয়া, তাহার অনেক কথা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে। ইহা কিন্তু রাজারাণী কিংবা দৈত্য-দানার গল্প নহে, তোমাদেরই পরিচিত কতকগুলি ইতরপ্রাণীর গল্প। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে রাজারাণীর মত সুন্দর এবং দৈত্য-দানারই মত ভীষণ প্রাণী যে নাই তাহা নহে, অথচ তাহাদের গল্প-কথা সব সত্য,—মিথ্যা কল্পনার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। গল্প যদি সত্য হয়, বল দেখি তাহা আরও মজার নয় কি?

পৃথিবীতে ছোট-বড় যত রকম প্রাণী আছে, তাহাদের মধ্যে মানুষ যে সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ জীব, এ বিষয়ে তোমাদের কিংবা অন্য কাহারও কোন সন্দেহ নাই। মানুষ ব্যতীত আর যত প্রাণী আছে তাহারা সকলেই ইতরশ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু প্রাণিজগতে মানুষের আসন সকলের উপর হওয়ার কারণ যে কি, সে বিষয়ে তোমরা কখনও বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখ নাই। হস্তী, গণ্ডার, তিমি, সিন্ধু-ঘোটক প্রভৃতি অতিকায় স্থলচর এবং জলচর কত শত প্রাণীই ত আকারে এবং দৈহিক শক্তিতে মানুষের চাইতে বড়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও ত তোমরা মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া স্বীকার করিতে চাও না! তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, শুধু দেহের আকার এবং শক্তির তারতম্য দ্বারা জীবজগতের কোন প্রাণীরই স্থান উপরে কিংবা নীচে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তোমরা হয়ত বলিবে যে, মানুষের প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি এবং নানা রকম কার্য্য করিবার ক্ষমতাই তাহাকে সকল প্রাণীর উপরে স্থান দান করিয়াছে। অবশ্য একথা যে খুব ঠিক, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের দেহ যদিও তুলনায় বহু অতিকায় প্রাণীর চাইতেই শক্তি ও আকারে নিতান্ত দুর্ব্বল এবং ছোট, তথাপি মানুষের দেহের আকার এবং গঠনপ্রণালীও তাহার শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি নিদর্শন। তোমরা জান মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির আধার—তাহার মস্তিষ্ক বা মগজ। মানুষের মাথাতে ইহা যেরূপ সুগঠিত, সেরূপ আর কোন প্রাণীতেই দেখা যায় না। তারপর মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এরূপভাবেই গঠিত এবং বিন্যস্ত যে, তাহারা আকারে খুব বড় না হইলেও, তাহাদ্বারাই মানুষ এমন সব কাজ করিয়া থাকে, যাহা অতিকায় প্রাণী, তাহাদের বিশাল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কখনও সম্পন্ন করিতে পারে না। তাহা হইলে ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, মানুষ আকারে খুব বড় না হইয়াও যে নিজকে সকল প্রাণীর চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহা শুধু তাহাদের আত্মাভিমান কিংবা গর্ব্বের কথা নহে।

জলে, স্থলে এমন কি বায়ুতেও ছোট-বড় অসংখ্য প্রাণী বিচরণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি তোমাদের খুবই পরিচিত। অন্য কতকগুলি আছে, যাহা তোমরা হয়ত দেখিয়া থাক কিন্তু লক্ষ্য কর না। কতকগুলি আবার এতই ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহাদিগকে খালি চোখে দেখিতে পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই যে ছোট-বড় নানা আকারের অসংখ্য ইতরপ্রাণী রহিয়াছে, উহাদের অভিনব, রহস্যপূর্ণ জীবনের কথা জানার আনন্দ, যাহাতে তোমরা লাভ করিতে পার, এই পুস্তকে তাহারই পথ প্রদর্শন করা হইল। যে সকল ইতরপ্রাণী তোমাদের পরিচিত, এবং যাহাদের সকল কথাই তোমরা হয়ত জান বলিয়া মনে কর, বাস্তবিকপক্ষে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের বিষয়েও অনেক কথাই তোমাদের জানা নাই। অধিকন্তু এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহাদের সম্বন্ধে তোমাদের ভ্রান্ত ধারণারও অন্ত নাই। জলে জন্মে এবং বাস করে বলিয়া, ছোট-বড় যত রকম চিংড়ি, কাঁকড়া আছে, তাহাদিগকে তোমরা অনেকেই ভুল করিয়া মাছ বলিয়া থাক। এমন কি সেই এক কারণেই তিমিকেও অনেকে মাছ বলিতে দ্বিধা বোধ কর না। বাদুড় এবং চাম্‌চিকা, পাখীর মত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় বলিয়া, হয়ত তোমরা উহাদিগকে পাখীই বলিয়া বসিবে। অথচ বাদুড় এবং চাম্‌চিকা পাখী হইতে অনেক বিষয়েই ভিন্নপ্রকৃতির প্রাণী। ঐ সকল বিষয় পরে তোমরা বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিবে। বিচারবুদ্ধি-সহকারে বিভিন্ন ইতরপ্রাণীর বিষয় আলোচনা করিলে পর, এরূপ ভুল-ভ্রান্তির আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

অসংখ্য ইতরপ্রাণীর প্রত্যেকটির বিষয় আলোচনা করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাণিগণের, উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ দ্বারা, আলোচনার পথ সহজ ও সুগম করিয়াছেন। বুদ্ধি-বৃত্তি ও দৈহিক গঠনে মানুষের সঙ্গে, যে প্রাণীর যত নিকট-সম্বন্ধ, তাহার স্থান তাঁহারা তত উচ্চে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সহস্র সহস্র

বৎসর পূর্ব্বে, পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া কোন প্রাণীই ছিল না, সমুদয় পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই জলে প্রথমতঃ শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ্ এবং তাহারই মত অতি ক্ষুদ্র প্রাণী দেখা দিয়াছিল। তাহা হইতেই যথাক্রমে মাছ, ব্যাঙ্, সরীসৃপ, পাখী, পশুর সৃষ্টি; এবং ইতরপ্রাণীদের ক্রমশঃ উন্নতি হওয়াতে অবশেষে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে! কথাটা শুনিতে নিতান্তই যেন গাঁজাখোরী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কোন কোন জ্ঞানী প্রবীণ পণ্ডিত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এরূপভাবে ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে, তাহাকে নিতান্ত গাঁজাখোরী কিংবা পাগলের প্রলাপ বলা কোনমতেই সমীচীন নহে। এই পণ্ডিতগণের মধ্যে মহামতি ডারউইন সাহেবের নাম তোমাদের সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। তিনিই প্রাণিজগতের এই ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তন-বাদের প্রবর্ত্তক। তিনি তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও গবেষণা দ্বারা এবিষয়ে অন্যান্য জ্ঞানী লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তোমরা বড় হইলে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবে। উহা সত্য হইলে, ভাবিয়া দেখ, ইতরপ্রাণীর সঙ্গে আমাদের কত বড় নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং তাহাদের বিষয় জানা কত বেশী প্রয়োজনীয়।

এই পুস্তকে যে সকল প্রাণীর কথা বিবৃত করা হইল, সে সকল প্রাণীর কতকগুলি খুবই সহজ-লভ্য। হয়ত সেগুলি কোন না কোন কারণে, ইতিপূর্ব্বেই সাধারণভাবে তোমাদের সঙ্গে পরিচিত। উহাদের মধ্যে যেগুলি সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহা নিজেরাই পরীক্ষা করিয়া দেখিও, তাহা হইলে সহজেই সকল কথা বুঝিতে পারিবে, ভুল-ভ্রান্তিরও আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

জীব-জগতের শ্রেণীবিভাগ

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বর্ত্তমানে যে পন্থা অবলম্বনে প্রাণীদিগেব শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহার অন্ততঃ সাধারণ একটা ধারণা তোমাদের সকলেরই থাকা দরকার। সাধারণভাবে তাহাই এখানে বলা হইল। তোমরা সর্ব্বদাই একথা মনে রাখিবে যে, পৃথিবীতে এখনও বহুপ্রাণী মানুষের অজ্ঞাত রহিয়াছে, সুতরাং কোন নূতন প্রাণীর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে এই শ্রেণীবিভাগের পরিবর্ত্তন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। প্রাণী সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেও এরূপ কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাই বলিয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের এই শ্রেণীবিভাগ নিতান্ত মনগড়া কথা নয়। প্রাণীদিগেব রক্তের নৈকট্য, পূর্ণাঙ্গদেহের কঙ্কাল ও বাহ্যিক আকার, তাহাদের প্রাণের অবস্থা এবং মাটি ও পাহাড়-পর্ব্বতের তলা হইতে সংগৃহীত প্রাচীন প্রাণীর দেহাবশেষ প্রভৃতি বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া তবে তাঁহারা এই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীকে একটা নির্দ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়মানুযায়ী উচু নীচু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন।

মানুষ, গরু, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতির গ্রন্থিবদ্ধ খণ্ড খণ্ড হাড়ের দ্বারা গঠিত যে একটি শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড থাকে, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। সকল ইতরপ্রাণীর এরূপ মেরুদণ্ড থাকে না। পণ্ডিতগণ এই সত্য অবলম্বনে বিশাল প্রাণিজগৎকে প্রথমেই মেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডহীন এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গ্রীসদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিত এরিষ্টোট্‌ল্ (Aristotle)-এর সময় হইতে এই শ্রেণীবিভাগ চলিয়া আসিতেছে। এই বিভাগানুসারে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর স্থান মেরুদণ্ডী প্রাণীর নীচে; কেন যে নীচে তাহা তোমরা পরে বুঝিতে পারিবে। এই দুই প্রধান বিভাগের উচুনীচু হিসাবে আবার যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহার একটি

তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। এই পুস্তকে তালিকানুযায়ী নীচশ্রেণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীর ইতরপ্রাণীর আলোচনা করা হইয়াছে, পড়িবার সময় তোমরা তাহা লক্ষ্য করিও। ইহাতে প্রাণিজগতে ক্রমবিবর্ত্তনের ধারাও তোমাদের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

নানা প্রকারের ক্ষুদ্রতম জীবাণু, প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। উহারা প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্ যাহাই হউক না কেন, তাহারা যে সর্ব্বনিম্ন স্তরের—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তারপর উহারা মানবের প্রভূত উপকার এবং অপকার উভয়ই করিয়া থাকে। এজন্য তাহাদের কথাই প্রথমে বলা হইল।

১। **ক্ষুদ্রতম জীবাণু (Germs etc)**

২। **মেরুদণ্ডহীন প্রাণী (Non-chordata)**
- আদি কীটাণু (Protozoa)
- ছিদ্রবহুল কীটাণু (Porifera)
- শূন্যগর্ভ কীট (Cœlentera)
- কীট (Worms)
- খণ্ডিতাঙ্গ পোকামাকড় (Arthropoda)
- শম্বুকাদি প্রাণিবর্গ (Molusca)
- কণ্টকচর্ম্মী (Echinoderma)

৩। **মেরুদণ্ডী প্রাণী (Chordata)**
- প্রাচীনতম আদিমেরুদণ্ডী (Primitive chordates)
- চক্রতুণ্ডী বা বর্ত্তুলমুখী (Cyclostomes)
- মৎস্যবর্গ (Pisces)
- উভচর (Amphibia)
- সরীসৃপ (Reptilia)
- পক্ষিবর্গ (Aves)
- স্তন্যপায়ী (Mammalia)

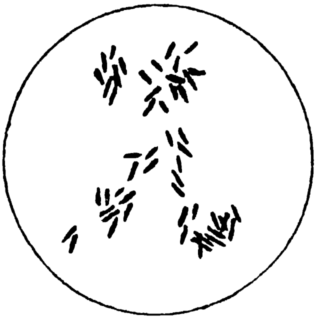


ক্ষুদ্রতম জীবাণু

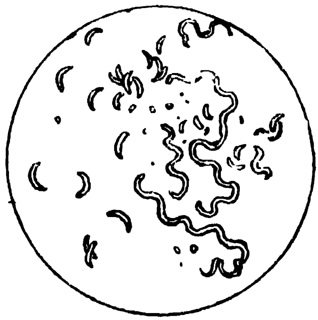
ক্ষুদ্রতম জীবাণু
(Microbe)

যে সকল ইতরপ্রাণী সচরাচর তোমরা দেখিতে পাও, তাহাদের মধ্যে মশা, মাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণীকেই তোমরা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক। অবশ্য ইহারা যে ক্ষুদ্রপ্রাণী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের চাইতেও যে কত ক্ষুদ্র জীবাণু পৃথিবীতে আছে, বুঝাইয়া না দিলে তোমরা তাহার একটা ধারণাই করিতে পারিবে না। খালি চোখে তোমরা যত প্রাণী দেখিতে পাও, তাহার চাইতে, দেখিতে পাও না এরূপ অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর সংখ্যা অনেক বেশী। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল জীবাণু এবং প্রাণীকে সহস্র সহস্র গুণ বড় করিয়া দেখিলে তবে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কোন কোন জীবাণু আবার এতই ক্ষুদ্র যে, তাহাদিগকে পাশাপাশি সমসূত্রে সাজাইয়া রাখিলে, তাহাদের সহস্র সহস্র জীবাণুতেও আধ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হয় না। একটি প্রকাণ্ড পুকুরে তোমরা অনেকে একত্র হইয়া সাঁতার কাটিতে যেমন কোন অসুবিধা বোধ কর না, তেমনি এক ফোঁটা জলে এরূপ বহু জীবাণু একত্রে অনায়াসে সাঁতার কাটিতে পারে, তাহারা কোন অসুবিধা বোধ করে না। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে পৃথিবীতে এত ক্ষুদ্র জীবাণুও বর্ত্তমান আছে যে, তাহাদের অস্তিত্ব অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যেও নির্ণয় করা অসম্ভব। এখন ভাবিয়া দেখ ইহারা কত ক্ষুদ্র! এই জীবাণুগুলি প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্ অবশ্য এ বিষয় নিয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। এখানে সে বিষয়েরই সাধারণ-ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।

উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী উভয়েরই প্রাণ আছে। জন্ম-মৃত্যু এবং বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি সজীবতার লক্ষণগুলি, কম বেশী তোমরা উভয়ের মধ্যেই দেখিয়া থাক। এখন যদি তোমাদিগকে প্রশ্ন করা যায় যে, প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে তফাৎ কি? তাহা হইলে তোমরা হয়ত সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিবে যে, প্রাণী চলাফেরা করে, উদ্ভিদ্ তাহা পারে না এবং করে না। এইত তাহাদের মধ্যে মস্ত বড় তফাৎ। অবশ্য সাধারণভাবে দেখিতে গেলে ইহাই যে তাহাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য বলিয়া বোধ হয়, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ তোমাদের পরিচিত ছোট বড় গাছপালাগুলিকে সর্ব্বদাই তোমরা এক যায়গাতেই থাকিতে দেখ; পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি সুবৃহৎ প্রাণীর ন্যায় কোন প্রাণীকেই এক যায়গায় থাকিতে দেখ না; সুতরাং তোমাদের এরূপ ধারণা হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্ষুদ্রতম গাছপালা এবং প্রাণী, এই উভয়েরই যদি তোমরা তুলনা করিয়া দেখ, শুধু নড়াচড়া দেখিয়া তাহাদিগকে প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ বলিতে পারিবে না। অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের নড়াচড়া সেই শ্রেণীর জীবন্ত প্রাণীর চাইতে কোন অংশেই কম নহে। তারপর এমন প্রাণীও আছে যাহারা মোটেই নড়াচড়া করে না। এসব ক্ষেত্রে তাহাদের জীবন-ধারণপ্রণালীর সকল বিষয় ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া তবে তাহাদিগকে প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দীর্ঘকাল মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া, পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে জীবাণু (microbe,

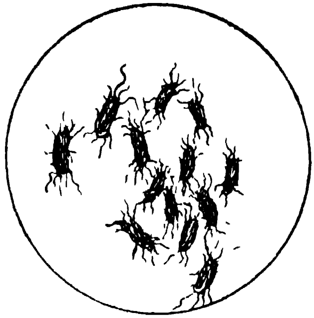


যক্ষ্মার জীবাণু



কলেরার জীবাণু

germ etc) এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যক্ষ্মা, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও পীতজ্বর, টাইফয়েড্ প্রভৃতি মারাত্মক রোগের জীবাণুরূপে পণ্ডিতদিগের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। সকল জীবাণুই যে ইহাদের মত মারাত্মক তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার মানুষের জীবন-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। এমন কি, ইহারা না থাকিলে মানুষের বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব হইত। এই যে অতি ক্ষুদ্র জীব, লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, যুগপৎ মানুষের ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই করিয়া আসিতেছে, ইহাদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে তোমরা নিশ্চিতই আনন্দলাভ করিবে।

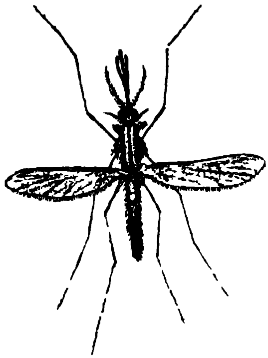


টাইফয়েডের জীবাণু

কাহারও কাহারও মতে ইহারা উদ্ভিদ্‌শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। যদিও ইহাদের খাদ্যসংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরই অনুরূপ, তথাপি অন্যান্য কারণে তাঁহারা ইহাদিগকে উদ্ভিদই বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক কিন্তু ইহাদিগকে প্রাণী এবং উদ্ভিদের মাঝামাঝি জীব বলিয়া ধরিলেই ঠিক হয়। তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে না। ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ইহাদের বিষয় বর্ত্তমানে আলোচনা করা তোমাদের পক্ষে হয় ত সম্ভবপর হইবে না, তথাপি মোটামুটি ইহাদের বিষয় তোমাদিগের কিঞ্চিৎ জানা থাকা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র হইলেও ইহারা মোটেই উপেক্ষার জিনিষ নহে। পৃথিবীতে বহু ধ্বংস এবং গঠনের কার্য্য ইহাদের দ্বারাই সাধিত হয়। পরে এ কথা আরও ভালমত বুঝিতে পারিবে। যে কয়েকটি জীবাণুর ছবি এখানে দেওয়া হইল আশা করি তাহাতে ইহাদের বিষয় তোমাদের বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

অণুবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে ঐ সকল জীবাণুর অস্তিত্ব কাহারই জানা ছিল না। জ্ঞানী পণ্ডিতগণ এই যন্ত্রের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়া

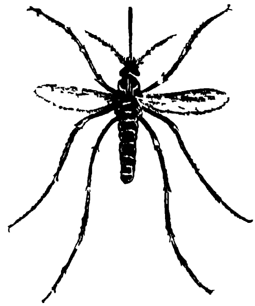
বহু উপকারী এবং অপকারী জীবাণুর অস্তিত্ব ও আকার নির্ণয় করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া জ্বরের বিষাক্ত বীজাণু মশার দ্বারা মানুষের দেহে সঞ্চারিত হয় এই ধারণা বহু বৈজ্ঞানিকের মনে স্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ডাক্তার রস্ (Major Donald Ross) ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং এই কার্য্যে হাত দেন।



এনোফেলিস মশা।
(ম্যালেরিয়া-জ্বরের বাহন)

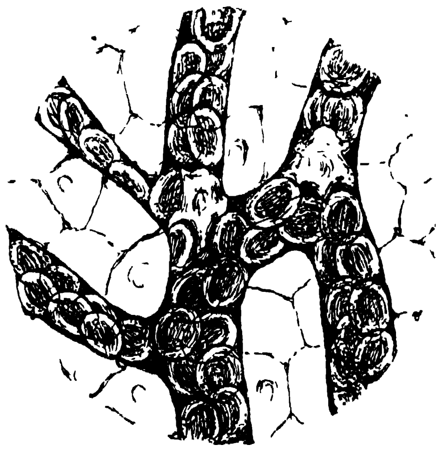
তিনি শত শত মশা পরীক্ষা করিয়া এবং বহুবার অকৃতকার্য্য হইয়া, কয়েক মাস পরীক্ষার ফলে এনোফেলিস্ (anopheles) নামক মশার দেহে এই জ্বরের বীজাণুর সন্ধান পান। তিনি পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই মশা ম্যালেরিয়া জ্বরের দ্বারা আক্রান্ত রোগীর দেহ হইতে রক্ত শোষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, এই রোগের বীজাণুও শোষণ করিয়া থাকে। তাহারই ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে, এই বীজাণুগুলি অতি অল্পসময়েই সংখ্যায় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া শিরা উপশিরায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং এই বিষাক্ত জীবাণুগুলি গর্ত্তের ভিতরে জমা হয়। তারপর এই মশা অন্য কোন লোককে দংশন করিলে ম্যালেরিয়া-বীজাণু তাহার দেহে রক্তের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে সে-ও ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়। এইরূপে এনোফেলিস্ মশাদ্বারা এই জ্বরের বীজাণু অল্প সময়ের মধ্যেই বহুলোকের

দেহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ডাক্তার রস যখন ভারতে ম্যালেরিয়া জ্বরের



ষ্টিগোমিয়া মশা।
পীতজ্বরের বাহন)

কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী ছিলেন, তাহার কিছুকাল পরেই মেজর রিড্ (Major Walter C. Reed) সাহেব এবং তাঁহার সহকর্ম্মী কয়েকজন লোক

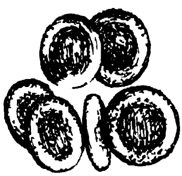


ধমনীর ভিতরে লাল ও সাদা রক্ত-কণিকা

কিউবা-(Cuba)-তে পীতজ্বরের (yellow fever) জীবাণুর অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের দেহে ষ্টিগোমিয়া (stigomiya) নামক মশকের দংশনের ফল পরীক্ষা কালে, তাঁহারা

মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু ষ্টিগোমিয়া নামক মশাই যে পীতজ্বরের বাহন তাহা, তাঁহারা অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া শত শত লোকের জীবন রক্ষার পন্থা নিদ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল লোক মানবের হিতার্থে এরূপ জীবনদান করিতে পাবেন, তাঁহাবা সকলেই আমাদেব ভক্তির পাত্র। রোগ উৎপাদক এইরূপ জীবাণু ছাড়াও মানুষেব প্রয়োজনীয় ফুল, ফল এবং শাকসব্‌জীব অনিষ্টকারী জীবাণুরও অন্ত নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই সকল জীবাণুর মধ্যে কতকগুলি জীবাণু আমাদেব খুবই উপকারী। হয়ত তাহারা না থাকিলে আমাদেব জীবন ধাবণ করাই অসম্ভব হইত। আমাদেব দেহের ভিতব উপকাবী এবং অপকাবী উভয় রকমের বীজাণুই অহরহ প্রবেশ করিয়া থাকে। উপকারী জীবাণুগুলি আমাদেব দেহের অনিষ্টকারী জীবাণুগুলিকে বধ কবিয়া আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার সাহায্য করে। কোন কারণে দেহে অনিষ্টকারী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, কিংবা উপকাবী জীবাণুব সংখ্যা হ্রাস হইয়া গেলে, আমাদের শরীব অসুস্থ হইয়া পড়ে। দেহের মধ্যে উপকারী ও অপকারী জীবাণুর মধ্যে অবিরাম সংগ্রাম চলিতে থাকে। রক্ত তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। যদি এক ফোঁটা রক্ত অণুবীক্ষণ-যন্ত্রেব সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখ তবে বর্ণবিহীন জলীয় পদার্থে অসংখ্য লাল রঙের রক্ত-কণিকার সঙ্গে কয়েকটি সাদা কণিকাও ভাসমান দেখিতে পাইবে। এই সাদা কণিকাগুলি আমাদের দেহের ভিতরকার বহু অপকারী বিষাক্ত জীবাণুর ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে। কোন কাবণে আমাদের রক্তে এই সাদা-কণিকার হ্রাস হইলে পর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে

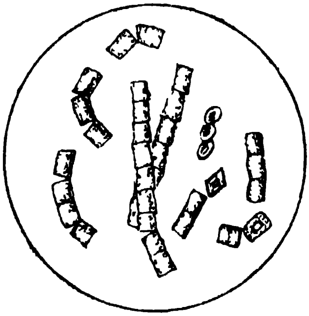


লাল বক্ত-কণিকা



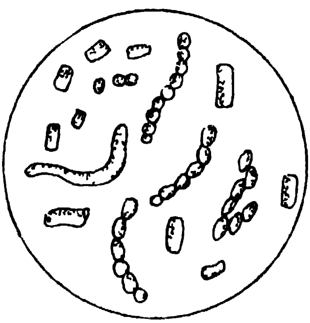
সাদা বক্ত-কণিকাব রোগেব জীবাণু ভক্ষণ

ইহারা আমাদের দেহের উপকারী এক প্রকার জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা ছাড়া আরও নানা প্রকারের জীবাণু আছে যাহারা আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান ছাড়াও বহু আবশ্যকীয় কার্য্য করিয়া থাকে। পৃথিবীতে যাহা কিছু সতেজ এবং জীবন্ত দেখিতে পাও, তাহা সকলই এই সকল জীবাণুর নীরব ও অক্লান্ত কর্ম্মের ফল। পচা গলা উদ্ভিদ কিংবা



দধি-মাখন-উৎপাদক জীবাণু

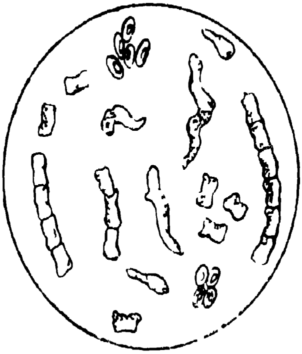
মৃতদেহ, যাহা তোমরা নিতান্ত ঘৃণা কর, তাহারা সকলেই ইহাদের চেষ্টায় নবপল্লবশোভিত উদ্ভিদ অথবা নূতন জীবন্ত প্রাণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।



পনীর-উৎপাদক জীবাণু

তোমরা হয়ত বলিতে পার যে, ইহারা কি ভোজবাজী জানে যে মৃতকে জীবন্ত করিবে? বাস্তবিক ইহাদের কাজ দেখিলে এরূপেই মনে হয়। যত রাজ্যের পচা গলা আবর্জ্জনা ইহারাই ভূমির সার এবং বহুপ্রাণীর

খাদ্যরূপে পরিণত করিয়া উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে সতেজ এবং পুষ্ট করে। এইরূপ কতকগুলি উপকারী জীবাণুর সাহায্যেই দুধ হইতে দধি, মাখন, পনীর প্রভৃতি ও তাল এবং খেজুরের রস হইতে সোরা বা মদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীতে ইহাদের কাজের অন্ত নাই।



মদ্য-উৎপাদক জীবাণু

ইহারা লম্বা, গোল, কমা ও স্প্রিং প্রভৃতি নানা আকারেরই হইতে দেখা যায়। একটি জীবাণু খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু নূতন জীবাণুর সৃষ্টি হইতে পারে; অথবা যে কোন একটি জীবাণুর উপর মালার মত বহু দানা উৎপন্ন হইয়া তাহারা ক্রমশঃ পৃথক্ হইয়া যায় এবং নূতন জীবাণুরূপে পরিণত হয়। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই ইহারা বহু জীবাণুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। বড় হইয়া এদের বিষয় আলোচনা করিলে আরও অনেক কথা জানিতে পারিবে।

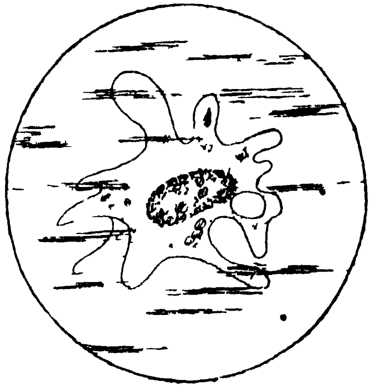


প্রথম অধ্যায়

আদি কীটাণু

(Protozoa)

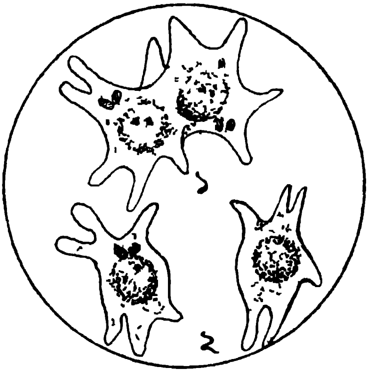
আদি কীটাণুর মধ্যে এমিবার (amoeba) স্থান সকলের নীচে। ইহার দেহ মাত্র একটি কোষের (cell) দ্বারা গঠিত। আদি কীটাণুর সকল প্রাণীর দেহই এইরূপ। ইহারা সকলেই এক কৌষিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এমিবা হইতেই প্রাণিজগতের সূত্রপাত হইয়াছে। যদিও তোমরা অতি সহজেই ইহাকে সংগ্রহ করিতে পার কিন্তু অতীব ক্ষুদ্র বলিয়া, অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ইহাকে খালি চোখে কখনই দেখিতে পাইবে না। ইহারা সাধারণত পরিষ্কার জলে, পুকুরের তলার কাদাতে, রাস্তার



জলের মধ্যে এমিবা

ধারে জল-নিকাশের পথে এবং প্রায় সকল রকম স্যাৎসেতে যায়গাতেই জন্মিয়া থাকে। ইহারা আকারে অতীব ক্ষুদ্র হইলেও জীবন্ত প্রাণীর যত কিছু সজীবতার লক্ষণ ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বহুরূপীর মত ইহারা আপনাদের আকার অনবরত পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। যে কোন জীবন্ত প্রাণীর মত ইহাদের বাড়িবার ক্ষমতা, স্পর্শানুভব শক্তি, খাদ্যসংগ্রহ ও হজম করিবার ক্ষমতা আছে। শুধু তাহাই নহে, তোমরা যেমন শ্বাসগ্রহণ করিয়া থাক, ইহারাও তেমনি অম্লজান (oxygen) বাষ্প গ্রহণ করে। তা ছাড়া নিজেরাই বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। পরে এই প্রত্যেক খণ্ডই এক একটি নূতন এমিবাতে পরিণত হয়।

অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে পরীক্ষা করিলে যেরূপ দেখা যায় তাহার ছবি দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যভাগে যে কাল অপেক্ষাকৃত ঘন পদার্থ দেখিতে পাইতেছ ইহাই তাহার কর্ম্মশক্তির মূলাধার। ইহাকে কর্ম্মকেন্দ্র (nucleus) বলিতে পার। এই কর্ম্ম-কেন্দ্রকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া, তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত তরল ও ছোট-বড় কণিকাপূর্ণ জীবপঙ্ক (protoplasm) নামক জীবন্ত পদার্থ অঙ্কিত আছে। এই জীবপঙ্কের স্থানে স্থানে যে গোলাকার ফাঁকা যায়গা রহিয়াছে তাহাদিগকে সঙ্কোচশীল অণুকোষ (contractile vacuole) বলে। এছাড়া, লক্ষ্য করিলে, ইহাদের মধ্যে খাদ্যাণুকোষ (food vacuole) অর্থাৎ খাদ্য রাখিবার কুঠরীও দেখিতে পাইবে। অতি ক্ষুদ্র প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্ সকলেরই দেহে খাদ্যের জন্য এইরূপ কুঠরী থাকে। ইহারই ভিতরে খাদ্য আবদ্ধ করিয়া ইহারা হজম করে।

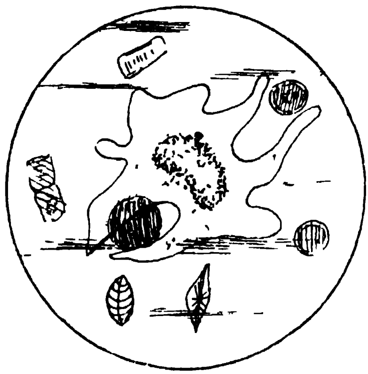


এমিবার বংশবৃদ্ধি

১। প্রথম অবস্থা।

২। দ্বিতীয় অবস্থা।

এমিবা তোমাদের মত এদিক্ সেদিক্ বেড়াইতে পারে। বেড়াইবার জন্য ইহার চারিদিকে লম্বা লম্বা কয়েকটি পা গজাইয়া থাকে। তাহারই সাহায্যে ইহারা অনবরত নড়াচড়া করে। যখন কোন খাদ্যের সন্ধান পায়, তখন এরূপ লম্বা দুইটি অঙ্গের মধ্যভাগে, তাহারা খাদ্য-কণিকাকে বেষ্টন করিয়া ধরে, এবং তখনই সেই দুইটি অঙ্গ পরস্পর সম্পূর্ণ মিলিত হইয়া যায়। এইরূপেই



এমিবার খাদ্য সংগ্রহ

তাহারা খাদ্যসংগ্রহ করে এবং এইরূপেই তাহাদের দেহে খাদ্যাণুকোষের উৎপত্তি হয়। ইহাদের দেহের চারি ভাগের তিন ভাগই জল, সুতরাং জলাভাবে ইহারা বড় কাবু হইয়া পড়ে। জলাভাবে যখন চলাফেরার অসুবিধা হয়, তখন ইহারা গোলাকার হয় এবং একটি আবরণে আবৃত হইয়া আত্মরক্ষা করে। আবার যখন জল পড়িয়া ভূমি আর্দ্র হইয়া যায়, তখন তাহারা পূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়া চলাফেরা করিতে থাকে।

ক্ষুদ্র প্রাণী হইলেও ইহারা ভূমিতে থাকিয়া একটা মস্ত বড় কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের সাহায্যে ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। এমিবার মধ্যে কোন কোন এমিবা আবার বড়ই অপকারী। এক জাতীয় এমিবা আছে, তাহারা আমাশয় রোগের বীজাণু বলিয়া মানুষের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছিদ্রবহুল কীটাণু

(Porifera)

—o—

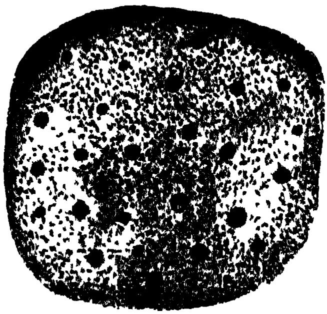
স্পঞ্জ

(Sponges)

তোমরা প্রায় সকলেই স্পঞ্জ দেখিয়াছ। ছিদ্রবহুল কীটাণুর ইহাই একটি উদাহরণ। সাবান দ্বারা শরীর পরিষ্কার করিবার সময় আমাদের দেশে কেহ কেহ স্পঞ্জের ব্যবহার করিয়া থাকেন। সকল সভ্য দেশেই বর্ত্তমানে ইহার বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। তোমাদের মধ্যে যদিই কেহ স্পঞ্জ না দেখিয়া থাক, তবে যে কোন বড় বেনেতি দোকানে খোঁজ করিলেই ইহা দেখিতে পাইবে। শুধু আজকালই যে ইহার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা নহে, প্রাচীনকালেও নানা কাজে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। প্রাচীন গ্রীকগণ তাঁহাদের শিরস্ত্রাণের ভিতরে ইহার ব্যবহার করিতেন। এমন কি তাঁহারা লণ্ডন নগরেও ইহার চালান দিতেন বলিয়া শুনা যায়।

স্পঞ্জ দেখিয়া আপাততঃ তোমাদের উদ্ভিদ্ বলিয়াই মনে হইবে, বাস্তবিক কিন্তু ইহা উদ্ভিদ্ নহে। ইহা বহু কৌষিক (multicellular) শ্রেণীর সর্ব্ব নিম্নস্তরের প্রাণী। তোমরা হয়ত বহু কৌষিক প্রাণী কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পার নাই। যে সকল প্রাণিদেহ, বহু কোষ অর্থাৎ কুঠরীতে গঠিত তাহাদিগকেই বহু কৌষিক শ্রেণীর প্রাণী বলা হয়। এমিবা

এবং তাহারই মত অন্যান্য যে এক কোষিক জীবাণুর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে বাদ দিলে, অন্যান্য সকল প্রাণীই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী—সকলই এই শ্রেণীর প্রাণীর উদাহরণ।



সমুদ্রজাত স্পঞ্জ

অধিকাংশ স্পঞ্জই সমুদ্রের নোনা জলে জন্মিয়া থাকে। পরিষ্কার জলে শুধু এক জাতীয় স্পঞ্জ সচরাচর জন্মিতে দেখা যায়। ইহারা প্রাণী হইলেও সাধারণ উদ্ভিদের মতই কখনও নড়াচড়া করিতে পারে না। উদ্ভিদ্ বলিয়া ইহাদিগকে ভুল হওয়ার ইহাও একটি কারণ। জলের তলায় ইহারা পাথর কিংবা অন্য কিছুর সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া জন্মিয়া থাকে। তোমরা যে স্পঞ্জ ব্যবহার করিয়া থাক, কিংবা ব্যবহার করিতে দেখ, তাহা স্পঞ্জের পঞ্জর বা দেহের কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাদের দেহ অত্যন্ত ছিদ্রবহুল। ইহাদের ছিদ্রগুলি আবার দুই রকমের। কতকগুলি বেশ বড় বড়,—ইহারাই এদের মুখস্বরূপ। এছাড়া পরীক্ষা করিলে আরও বহু ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। জীবিত অবস্থায় এই ছিদ্রপথে স্পঞ্জের ভিতর অনবরত জলস্রোত প্রবেশ করে এবং বড় বড় ছিদ্রগুলির মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে। এই জলস্রোতের সঙ্গে ইহাদের আবশ্যকীয় অম্লজানবাষ্প ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্যকণা ইহাদের দেহের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে এবং খাদ্য হজম হইলে পর, ভুক্তাবশিষ্ট পরিত্যক্ত জিনিষগুলি বড় বড় মুখের ভিতর দিয়া জলস্রোতের সঙ্গে বাহির হইয়া আসে। ইহাদের গর্ত্তের ভিতরে এই জলস্রোত প্রবাহিত হওয়ার জন্য বেশ সুন্দর একটি ব্যবস্থা আছে। গর্ত্তের ভিতরে খুব সূক্ষ্ম বহু রোম থাকে। ইহারা অনবরত



পুকুরের জলে জাত স্পঞ্জ

নড়িতে থাকে বলিয়াই স্পঞ্জের ভিতরে এই স্রোতের উৎপত্তি হয়। গর্ত্তের আবরণ, কখনও চূণা পদার্থ, কখনও বা লম্বাকারের কণা, কখনও বা পাথরচূর্ণে পরিপূর্ণ থাকাতে স্পঞ্জের দেহ অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া যায়। পীত বর্ণের স্পঞ্জ, যাহা সাধারণতঃ স্নানের সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের পঞ্জর সূক্ষ্ম সূত্রাকারের রোমের দ্বারা গঠিত হয়।

স্পঞ্জের উপর নূতন নূতন কুঁড়ি গজাইয়া সচরাচর ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কখনও কখনও দুইটি স্ত্রী এবং পুংকোষের মিলনেও স্পঞ্জের উৎপত্তি হয়। স্পঞ্জ খণ্ড খণ্ড হইয়াও নূতন স্পঞ্জের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। স্পঞ্জের চাষ করিবার জন্য স্পঞ্জের টুকরা সিমেণ্টের উপর রোপণ করিয়া সমুদ্রের জলমগ্ন চড়ার উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। এক বৎসর কিংবা দুই বৎসরের মধ্যেই তাহারা তাড়াতাড়ি বেশ বড় হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার মৃত্যুমুখেও পতিত হয়।

জীবন্ত স্পঞ্জের পঞ্জর মানুষের ব্যবহারের জন্য কোথায় কিরূপে সংগ্রহ ও পরিষ্কার করা হয়, তোমরা হয়ত তাহার বিষয় কিছুই জান না। এখন তাহার কথাই বলিতেছি। বহু বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকগণ ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগর হইতে স্পঞ্জ সংগ্রহ করিতেন। বর্ত্তমানে প্রধানতঃ তুরষ্ক ও ইটালীর উপকূলে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও স্রোতোহীন জল হইতে স্পঞ্জ সংগ্রহ করা হয়। প্রাচীনকালে ডিঙ্গীতে চড়িয়া সমুদ্র হইতে স্পঞ্জ সংগ্রহ করা হইত। প্রত্যেক ডিঙ্গীতে মাত্র দুই জন লোক থাকিত। তাহাদের মধ্যে একজন নৌকার হাল ধরিত এবং অপর ব্যক্তি বর্শার মত বাঁকা-আগা একটি লম্বা ছিপের সাহায্যে জলের তলা হইতে স্পঞ্জ তুলিয়া ডিঙ্গীতে জমা করিত। বর্ত্তমানে ডুবুরির পোষাক পরিয়াই লোকে জলের তলায় পাহাড়ের গা হইতে একেবারে এক একটি বাক্স বোঝাই করিয়া স্পঞ্জ তুলিয়া আনে। যে যায়গা হইতে স্পঞ্জ সংগ্রহ করা হয়, তাহার জল বেশ পরিষ্কার থাকাতে বিপদ-আপদের আশঙ্কা যদিও কম, তথাপি সে সব যায়গায় মাঝে মাঝে হাঙ্গর বাস করিতেও

দেখা যায়। হাঙ্গর দেখিলেই ডুবুরিরা চুপ করিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহা হইলে হাঙ্গর তাহাকে মৃত মনে করিয়া আর কোন অনিষ্ট করে না। কিন্তু ছুরি দিয়া আঘাত করিলে আর উপায় নাই। রক্তের গন্ধ পাইলে সেখানে দলে দলে আরও বহু হাঙ্গর আসিয়া হাজির হয়। তখন প্রাণ বাঁচান একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

সংগ্রহ করিবার সময় স্পঞ্জের দেহ পিচ্ছল পদার্থ ও একটি পাতল আবরণে আবৃত থাকে, নৌকায় তুলিয়া তাহা পরিষ্কার করা হয়। স্পঞ্জ যখন মরিতে আরম্ভ করে, তখন বড় বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়। স্রোতো-জলের খানিকটা যায়গা ঘেরাও করিয়া তাহার ভিতরে স্পঞ্জগুলি ছয় সাত দিন রাখিয়া দিলে অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যায়। তারপর উপরে তুলিয়া লাঠি দ্বারা ঠেঙ্গাইলেই ভিতরকার যাহা কিছু ক্লেদ বাহির হইয়া পড়ে। তখন স্পঞ্জের প্রকারভেদে সাবানজল, চূণের জল ইত্যাদি দ্বারা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। এই সময় ইহাদিগকে সম্পূর্ণ উদ্ভিদের মত দেখায়। সাধারণ পীতবর্ণের স্পঞ্জ চূণের জলেই বেশ পরিষ্কার হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

শূন্যগর্ভ কীট

(Cœlentera)

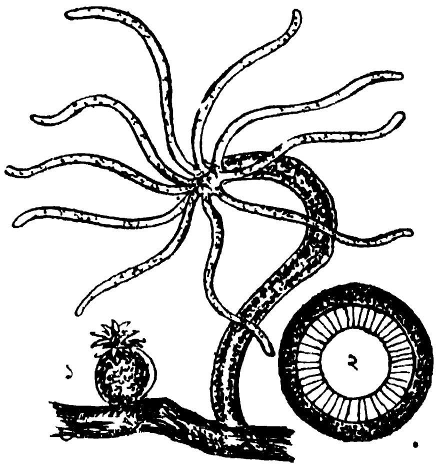
বহুকোষিক প্রাণীর মধ্যে স্পঞ্জের পরেই শূন্যগর্ভ কীটের স্থান। তাহাদের মধ্যে হাইড্রা (Hydra), জেলিমাছ (Jelly fish), এনিমোন (Anemone) প্রভৃতি বর্ত্তমানে প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের খুবই পরিচিত। ইহারা সকলেই জলজ প্রাণী এবং হাইড্রা ছাড়া এই শ্রেণীর সকল প্রাণীই সমুদ্রের নোনা জলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহাদের দেহ প্রধানতঃ একটি শূন্যগর্ভ নলের মত। লম্বালম্বি ভাবে যে কোন দিকে ইহাদিগকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের চর্ম্মের উপর বিভিন্ন স্থানে বিষাক্ত হুল আছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর প্রাণীর দেহের অগ্রভাগে, মুখের চারিদিকে শুঁয়া বা দাঁড়া থাকে। ইহাদেরই সাহায্যে তাহারা তাহাদের খাদ্যপ্রাণীদিগকে বন্দী করিয়া খায়।

হাইড্রা

(Hydra)

শূন্যগর্ভ কীটের মধ্যে হাইড্রা অতি সাধারণ কীট। সব সময় দেখা না গেলেও কোন কোন সময়ে পুকুরের জলে ইহাদিগকে জন্মিতে দেখা যায়। ইহারা প্রায়শঃ এক-চতুর্থ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং জলের ভিতর কোন না কোন আশ্রয়ের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। ইহাদের দেহের গঠন খুবই সাধারণ রকমের, দুইটি পরস্পর-সংলগ্ন আবরণ বিশিষ্ট একটি নল ছাড়া আর কিছুই নহে। এই নলের ভিতরে ইহাদের খাদ্য প্রথমতঃ

জমা হয় এবং তারপর হজমের কাজ চলিতে থাকে। ইহাদের খাদ্যপ্রাণী-গুলিকে বন্দী করিবার প্রণালীতেও একটু বিশেষত্ব আছে। ছবিতে লক্ষ্য করিলে ইহাদের মুখের চারিদিকে কতকগুলি শুঁয়া দেখিতে পাইবে। এই শুঁয়ার ভিতরে বিষাক্ত হুল থাকে। শুঁয়াদ্বারা বন্দী ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহে ইহা বিদ্ধ হইলে পর, তাহারা একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া যায়। তখন তাহাদিগকে খাওয়ার পক্ষে ইহার আর কোন বেগ পাইতে হয় না। যদি কোন কারণে এই প্রাণী দুই কিংবা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, তবে তাহার প্রত্যেক অংশ হইতেই নূতন হাইড্রার উৎপত্তি হয়। ইহার নাম হাইড্রা রাখার ইহাই একমাত্র কারণ। গ্রীস দেশীয় পৌরাণিক গল্পে হাইড্রা নামক একটি অতিকায় দানবের উল্লেখ আছে। তাহার বহুমাথা ছিল এবং কোন একটি মাথা কাটিয়া ফেলিলে, তাহার স্থানে আবার আর-একটি মাথা গজাইয়া উঠিত। আমাদের দেশের পৌরাণিক পুস্তক রামায়ণ হইতে রাবণের দশটি মাথার বিষয় তোমরা জান, তাহা হইতেই ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে। এও সেই রাবণের মত গ্রীস দেশীয় একটি দানব। এই কীটের যে কোন মাথা কাটিয়া ফেলিলে তাহা দানব হাইড্রারই মত পুনরায় গজাইয়া উঠে বলিয়া ইহার নাম হাইড্রা রাখা হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণে খাদ্য, জল ও আলোক পাইলে হাইড্রার কখনও কখনও কুঁড়ি গজায়। তাহা মূলপ্রাণী হইতে পৃথক্ হইয়া নূতন হাইড্রাতেও পরিণত হইতে দেখা যায়।



হাইড্রা

১। বামন হাইড্রা ২। হাইড্রার দেহে দুইটি সংযুক্ত আবরণ

জেলিমাছ

(Jelly fish)

জেলিমাছ শূন্যগর্ভ কীটের আর-একটি অতি সাধারণ উদাহরণ। ইহা সমুদ্রজলেই জন্মিয়া থাকে। জলস্রোতে সমুদ্রতীর ধৌত হইয়া গেলে পর চড়ার উপর বহু জেলিমাছ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিষ্কার দিনে ষ্টিমারের সঙ্গে, দলে দলে জেলিমাছ ভাসিয়া বেড়ায়। ইহারা দেখিতে কতকটা স্বচ্ছ সাদা গাছের পাতার মত। জেলিমাছ এই রং ছাড়া অন্য কোনও উজ্জ্বলতর রংএ কখনও রঞ্জিত দেখা যায় না। জেলিমাছ নানা রকমের থাকিলেও তাহাদের সকলেরই প্রকৃতি প্রায় একই রকমের। উষ্ণদেশের সমুদ্রজলে, যে সকল জেলিমাছ জন্মিয়া থাকে, রাত্রিবেলা তাহারা এক প্রকার উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ করে। ইহারা জল না পাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়। অনবরত জল পান করিবার জন্য জেলিমাছ তাহার দেহের সকল গর্ত্তই সব সময় উন্মুক্ত রাখে। ইহাদের দেহে জলের পরিমাণ এত অধিক যে, সমুদ্রতীরে ইহারা কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে পরে, শরীরের জলটুকু যখন শুকাইয়া যায়, তখন বালির উপরে একটি সাদা চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।



অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও হুলসমেত জেলিমাছ

জেলিমাছের দেহ জেলিরই মত কোমল। ইহা গোল এবং লম্বা দুই রকম আকারেরই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মুখের চারিদিক

এক প্রকার লম্বা ঝুলান শুঁয়া দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এই শুঁয়াগুলিতে হাইড্রারই মত বিষাক্ত হুল সংলগ্ন থাকাতে, ইহারা ইহাদের শিকারের গায়ে হুল বিদ্ধ করিয়া একেবারে অচল করিয়া ফেলে। ইহারা ইহাদের এই হুলবিশিষ্ট অঙ্গগুলি বাহিরে বিস্তৃত করিয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে। ইহাদেরই সাহায্যে ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া উদর পূর্ণ করে। জেলিমাছের উদরে গর্ত্ত ছাড়া আর বিশেষ কোন অন্ত্র নাই। সাধারণতঃ ইহারা ডিম্ব হইতে বাচ্চা উৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু কখনও কখনও ইহাদের দেহের উপর কুঁড়ি (bud) জন্মিতে দেখা যায়। সেই কুঁড়িগুলি দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া নূতন জেলিমাছের উৎপত্তি হয়।

সামুদ্রিক এনিমোন
(Sea-Anemone)

এনিমোন নানা প্রকারের সুন্দরবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া দেখিতে খুব সুন্দর দেখায়। ঐ সৌন্দর্য্যের জন্যই ইহাদের অন্য নাম জীবন্ত সামুদ্রিক পুষ্প। আপাততঃ দেখিলে ইহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলিয়াই বোধ হয়। বাস্তবিক কিন্তু ইহারা হাইড্রা কিংবা জেলিমাছেরই মত শূন্যগর্ভ কীটের আর একটি উদাহরণ। এনিমোনের অন্তর্গত কতকগুলি কীটের দ্বারাই সমুদ্রগর্ভে প্রবালের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রবাল, ইহাদের দেহ হইতে নিঃসৃত চূণা জাতীয় এক প্রকার মিশ্র পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইহাদের ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল। ইহাদেরও মুখের চারিদিকে বিষাক্ত শুঁয়া আছে, উহাদেরই সাহায্যে ইহারা চিংড়িমাছের ছোট বাচ্চা প্রভৃতি প্রাণী বন্দী করিয়া খাইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষুদ্র কোন প্রাণী একবার তাহাদের কবলে পতিত হইলে আর তাহার রক্ষা নাই। কখনও কখনও তাহারা অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বন্ধুভাবে একে অন্যের সাহায্যে জীবনযাপন করে। কাঁকড়ার পিঠে চড়িয়া তাহাকে শিকার ধরিবার সুবিধা করিয়া দেয় এবং

সুবিধামত শিকারে ভাগ বসায়। ছবিতে দেখ একটি এনিমোন ক্ষুদে চিংড়িমাছ ধরিবার জন্য একটি শামুকের উপর কেমন রাজার হালে বসিয়া আছে।

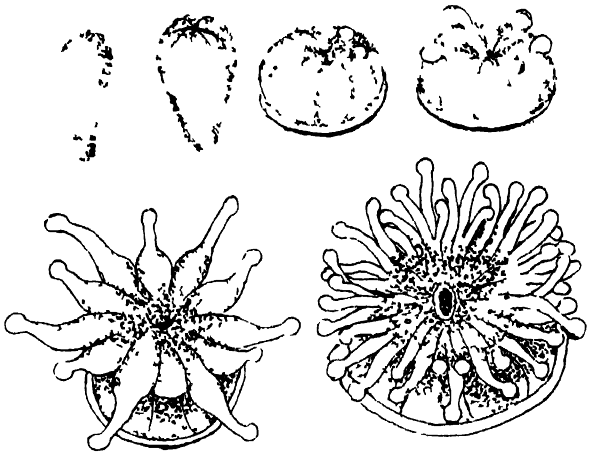


একটি সামুদ্রিক এনিমোন শামুকের উপর বসিয়া চিংড়িমাছের ছানা ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

নানারকম সুন্দর রংএর এনিমোন সমুদ্রতীরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা তাহাদের শুঁয়াগুলি সর্ব্বদাই বিস্তৃত করিয়া বসিয়া থাকে। তাহাদিগকে শুধু দেখিয়া, তাহারা কতটা যে ক্ষুধার্ত্ত, তাহার ধারণাই করা যায় না। কিন্তু কোন প্রাণী নিকটে আসিলেই, তাহাদের সেই শুঁয়াগুলি দ্বারা বিদ্যুদ্বেগে তাহাকে বন্দী করে এবং খাইয়া ফেলে।

জীবন্ত এনিমোন দেখিবার সুবিধা এবং সুযোগ তোমাদের না থাকিলেও প্রবাল হয়ত তোমরা প্রায় সকলেই দেখিযাছ। লাল, নীল প্রবালের মালা প্রায় সকল মনোহারী দোকানেই কিনিতে পাওয়া যায়। এই প্রবাল যে কি এবং কোথা হইতে পাওয়া যায়, তাহা বোধ হয় তোমাদের কাহারই জানা ছিল না। প্রবাল-উৎপাদক এনিমোনের দেহে, প্রবালই অস্থি বা পঞ্জরের কাজ করে। প্রবালকীট ক্রমশঃ বড় হইয়া কিরূপে প্রবাল উৎপাদন দ্বারা, একটি সুন্দর ফুলের আকার ধারণ করিতে পারে তাহা পর পৃষ্ঠার ছবির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে। ইহাদের বহুসংখ্যক কীট একত্র হইয়া বাস করে। তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন এবং পরস্পর সংলগ্ন প্রবালের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা থাকে। এইরূপে তাহারা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন আবাসস্থানের সঙ্গে পরস্পর সংযোগ রাখে। ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র কীট হইলেও সম্মিলিতভাবে কাজ করিয়া সমুদ্রের

ভিতর পাহাড় এবং দ্বীপের সৃষ্টি করে। অবশ্য এজন্য ইহাদিগকে সহস্র সহস্র বৎসর অনবরত কাজ করিতে হয়। পাহাড়ও আবার নিতান্ত ছোটখাট পাহাড় নয়। এই পাহাড়ে আঘাত লাগিলে সুদৃঢ় জাহাজের তলা পর্য্যন্ত ফাটিয়া যায়। এখন ভাবিয়া দেখ ইহাদের সম্মিলিত শক্তির ক্ষমতা কত



সামুদ্রিক এনিমোন ক্রমশঃ বড় হইয়া চোণা পদার্থের নিঃসরণ দ্বারা কিরূপে প্রবাল উৎপাদন করে, ছবিতে তাহা দেখান হইয়াছে

বড়! প্রবালকীটের সংখ্যাও আবার এত অধিক যে তাহা গণিয়া কখনই শেষ করা যায় না।

জন্মের অব্যবহিত পরে প্রবালকীট একখণ্ড ক্ষুদ্র কোমল জেলির মত থাকে। তাহার পর ক্রমশঃ দেহ হইতে প্রবালের শুঁয়া উৎপাদন করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আকারেরও পরিবর্ত্তন হয়। ছবিতেও তাহা দেখান হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবালকীট সমুদ্রেই জন্মে, সমুদ্রেই বাস করে এবং সমুদ্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

কীট

(Worms)

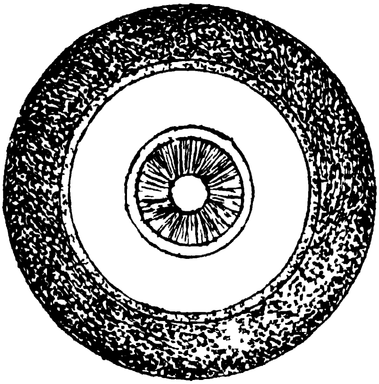
কীটপর্য্যায়-ভুক্ত প্রাণীব সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের সকলের বিষয় আলোচনা কবা কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। তোমরা বহু রকমেব ছোট ছোট ইতরপ্রাণী দেখিয়া থাক। তাহাদেব মধ্যে কতকগুলি হয়ত আবার তোমাদের খুবই পরিচিত। এখন ইহাদের মধ্যে কোন্‌গুলিকে যে কীট বলিবে তাহা তোমাদের জানা থাকা দবকাব। কীটের আকার-প্রকার আবাব এত বিভিন্ন রকমের যে, তাহাদেব সকলের কোন কোন সাধাবণ বাহ্যিক সাদৃশ্য ছাড়া, সার্ব্বজনীন আব বিশেষ কোন বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। এই জন্য কীটের শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিভিন্ন কীটের বিষয় আলোচনা করা হইল। এই শ্রেণীবিভাগের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিয়া যদি কীটগুলি পরীক্ষা কর, তবে তোমাদের বুঝিবার পক্ষে বেশ সুবিধা হইবে।

কীটমাত্রেবই দেহ সাধারণতঃ সরু লম্বা নলের মত এবং দেহেব উভয় পার্শ্ব সমভাবে গঠিত (bilateral symmetry) হয়। এই যে গঠনপ্রণালীর কথা বলা হইল, তাহা নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে কীটেই প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য তাহাদের চাইতে উচ্চতর যে কোন প্রাণীরই দেহের গঠনপ্রণালী যে এই নিয়মের অধীন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপ পশু পক্ষী মানুষ প্রভৃতি যে কোন প্রাণীর দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি প্রাণীকেই তোমরা সমান দুইভাগে বিভক্ত করিতে পার, ইহাতে বিন্দুমাত্রও ইতর-বিশেষ হইবে না। ইহাদের দেহ দুইদিকে সমান-

ভাবে বর্দ্ধিত হয় বলিয়াই এরূপ সমান দুইভাগে ভাগ করা সম্ভবপর হয়, নতুবা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তারপর সাধারণতঃ কীটদেহ কোন কঠিন আবরণে, কখনও বড় একটা আবৃত থাকিতে দেখা যায় না। অবশ্য কোন কোন সামুদ্রিক পোকা, বালি অথবা নিজেদের দেহনিঃসৃত চূণা পদার্থ নির্ম্মিত নলে বাস করিতে দেখা যায়। কোন কীটেরই কিন্তু পা নাই, তবে তাহারা যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন তাহাদের দেহের একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট প্রান্তই সম্মুখদিকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া অগ্রসর হয়। এই অগ্রভাগই তাহাদের মাথা। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ক্ষুদ্র প্রাণীরই একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট মাথা সবসময় সম্মুখে রাখিয়া চলিতে দেখা যায় না, সুতরাং ইহাও তাহাদের আর একটা বিশেষত্ব। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আবার এই পোকার মাথাতে প্রথমে মস্তিষ্ক বা মগজের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ইতরপ্রাণী হইতে কীটপর্য্যায়ভুক্ত প্রাণী আরও একটি কারণে উন্নত প্রাণী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, ইহা তাহাদের দেহ গঠনের বিশেষত্ব। কীটদেহেই প্রথমতঃ পর পর তিনটি আবরণের বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বাহ্য ও মধ্য আবরণের (ectoderm and mesoderm) মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁকা যায়গা থাকে। তাহার ভিতরেই ইহাদের আভ্যন্তরিক নানামত যন্ত্র অর্থাৎ নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি গুছান থাকে। এই ফাঁকা যায়গাকেই দেহনলী (cœlome) বলা হয়। মধ্য ও অন্তরাবরণের (mesoderm and endoderm) মধ্যে আর কোন ফাঁক নাই, তাহারা পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু অন্তরাবরণের মধ্যে অর্থাৎ দেহের ঠিক মধ্যভাগে আবার আর-একটি ফাঁকা নল থাকে, তাহাকে খাদ্যনলী (food-cavity) বলা হয়। ইহার ভিতরে খাদ্য থাকে। এই তিনটি আবরণের বিন্যাস পরীক্ষা করিয়া বুঝিবার পক্ষে যদি তোমাদের অসুবিধা বোধ হয়, তবে পর পৃষ্ঠায় যে ছবি দেওয়া হইল, তাহা হইতেও একটা ধারণা করিতে পারিবে। জীবজগতে এইরূপে অতিক্ষুদ্র নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর জীবাণু হইতে, কিরূপে

ক্রমশঃ উন্নততর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে, এখন হইতেই তোমরা তাহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবে।



সাধারণ কীটদেহ-গঠনে স্তর সমাবেশ

কীটের শ্রেণীবিভাগ করিবার সময় তোমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, ইহাদের কতকগুলির দেহ অঙ্গুরীর মত খণ্ড খণ্ড কতকগুলি অংশ সংযুক্ত হইয়া গঠিত হইয়াছে। কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি প্রাণীই তাহার উদাহরণ। এছাড়া কীটপর্য্যায়ের অন্যান্য প্রাণীর দেহ ইহাদের ন্যায় গ্রন্থিবদ্ধ থাকে না। ছোট বড় নানামত ক্রিমিকীট এবং তাহাদের মত অন্যান্য প্রাণীই ইহার উদাহরণ। এই অখণ্ড কীটগুলিকে আবার তাহাদের দেহগঠনের বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া আরও তিনটি উপশ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির দেহ প্রশস্ত অর্থাৎ চেপ্টা, কতকগুলির দেহ ফিতার মত লম্বা, আর কতকগুলির দেহ সূতার মত সরু।

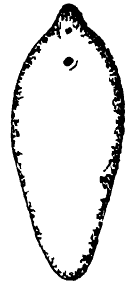
১। প্রশস্ত কীট

(Platyhelminthes)

মানুষের পেটের ভিতরে ফিতার মত প্রশস্ত এক প্রকার ক্রিমি জন্মিয়া থাকে, তাহা এবং মেষের যকৃতের ভিতরকার ক্রিমি, প্রশস্ত কীটের উদাহরণ। ইহারা উভয়েই পরাঙ্গপুষ্ট জীব (Parasite), অর্থাৎ অন্য প্রাণীর দেহ হইতে খাদ্য শোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের আক্রমণ মানুষ এবং মেষের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। ইহাদের কথা সংক্ষেপে এখানে কিঞ্চিৎ বলা হইল, তাহা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে।

মেষের যকৃৎক্রিমি
(Liver fluke—Fasciolahepatica)

ইহার আকার গাছের ডিম্বাকৃতি পাতার ন্যায়। দুইটি শোষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ইহারা মেষের যকৃৎ হইতে রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। ইহাদের পেটের ভিতরে নাড়িভুড়ি আছে সত্য, কিন্তু সাধারণ কীটের মত ফাঁক থাকে না। এই যকৃৎক্রিমির জন্ম-বিবরণ বড়ই রহস্যপূর্ণ। ইহাদের বাঁচিয়া থাকার জন্য সকল অবস্থাতেই জলের প্রয়োজন। সেজন্য শুষ্ক সমতল ভূমিতে যে সকল মেষ বিচরণ করে, তাহাদের পক্ষে এই ক্রিমির আক্রমণের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই।


মেষের যকৃৎ ক্রিমি.

ইহাদের বহুডিম্ব, পীড়িত মেষের যকৃৎ হইতে পিত্তকোষের ভিতর দিয়া পক্বস্থলীর নলে প্রবেশ করে, সেখান হইতে ক্রমে বাহির হইয়া আসে। এই ডিমগুলি স্যাঁৎসেতে জলা যায়গায় পড়িলে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ডিমের ভিতর কীটডিম্বের (Luva) উৎপত্তি হয়। পূর্ণাঙ্গ হইলে পর ডিম হইতে বাহিরে আসে। এই কীটডিম্ব আবার শুক্‌না যায়গায় পড়িলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কীটডিম্ব কাহাকে বলে হয়ত তোমরা বুঝিতে পার নাই। ডিম হইতে উৎপন্ন বাচ্চার প্রথমেই দেখিতে যদি পিতামাতার সঙ্গে কোন সাদৃশ্য না থাকে অর্থাৎ ভিন্ন আকারের হয়, তবে তাহাকে ডিম্ব হইতে উৎপন্ন কীট অর্থাৎ কীটডিম্ব বলে। ইহাদের বেলা ডিম হইতে প্রথমতঃ এই কীটডিম্বেরই উৎপত্তি হয়। এই কীট-ডিম্বগুলি জলে অবাধে সাঁতরাইতে থাকে এবং কোন ছোটখাট শামুক পাইলে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহার শ্বাসযন্ত্রের ভিতরে স্থান করিয়া লয়। সেখানে তাহারা অপেক্ষাকৃত বড় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করে। ইহাই এই কীটের দ্বিতীয় অবস্থা (The Redia)। সেখানে তাহারা আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন তৃতীয় অবস্থা (cercaria) প্রাপ্ত হয় তখন তাহারা প্রায়শঃই কোন আশ্রয়দাতা শামুককে বধ করিয়া বাহির

হইয়া আসে। এই সময় তাহারা সাঁতরাইয়া কোন জলা ঘাসের পাতাতে আশ্রয় নিয়া থাকে। সেই পাতাতে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া বাস করে। ক্ষুধার্ত্ত মেষ সেই পাতা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মেষের পেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া যকৃৎ আক্রমণ করে। তারপর সেখানে তাহাদের ডিম পাড়িবার পালা।

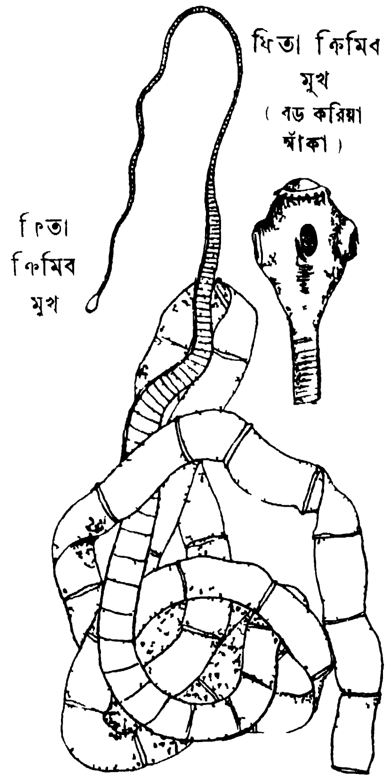
এই যে ক্ষুদ্র ক্রিমিকীট, দেখ দেখি তাহার জীবনেরই বৈচিত্র্য কত! মেষ ও শামুক দুইটি প্রাণীকে বধ করিয়া তাহারা তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের আক্রমণে সহস্র সহস্র মেষ এইরূপে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। এই ক্রিমিকীট দ্বারা আক্রান্ত মেষকে রক্ষা করিতে হইলে, তাহার একমাত্র উপায়, সেই মেষকে একদম জল খাইতে না দেওয়া। জলের অভাবে এই কীটের বীজ যে ভাবেই থাকুক না কেন, নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

ফিতা ক্রিমি (Tape-worm)

মানুষের পেটে যে ফিতা কৃমি জন্মিয়া থাকে তাহার জীবনীও এই মেষের যকৃৎক্রিমির মতই রহস্যজনক। ইহার আকার লম্বা শিকলের মত খণ্ড খণ্ড অংশ সংযুক্ত এবং প্রত্যেক খণ্ডেই এক দফা ডিম্ব উৎপাদক পদার্থ (gonads) আছে। ইহাদের মাথা খুব ছোট, তাহাতে কতকগুলি বাঁকা কাঁটা এবং শোষণ-যন্ত্র আছে। ইহাদের সাহায্যে তাহারা মানুষের অন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া রক্ত শোষণ করে। ইহারা ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। অনেক সাপের চাইতেও তাহারা লম্বায় বড় হইয়া থাকে। সাপের কামড়ে মানুষের যখন-তখন মৃত্যু হয়, কিন্তু এদের কামড়ে ও রক্তশোষণে মানুষ অল্পে অল্পে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এই যা তফাৎ।

ইহাদের লেজের দিকের শেষখণ্ড যেই পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা তখন পৃথক্ হইয়া মানুষের মলের সহিত বাহির হইয়া পড়ে। ইহার

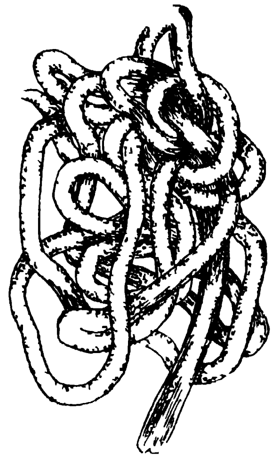
ভিতরে এই ক্রিমির বহু ষট্‌কাঁটা বিশিষ্ট ভ্রূণ (hexacanths) থাকে। সেই মল আবার কোন শূকর গলাধঃকরণ করিলে সেই বর্শার মত ছয়টি কাঁটা-যুক্ত ভ্রূণের দল শূকরের খাদ্যনলীর ভিতরে বিস্তৃত হয় এবং সেখান হইতে ইহারা মাংশপেশির ভিতরে গর্ত করিয়া আপনাদের যায়গা করিয়া লয়। ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত শূকরের কাঁচা অথবা অল্পসিদ্ধ মাংস খাইলে ইহারা মানুষকে আক্রমণ করে। এদের বেলায়ও বংশবৃদ্ধির জন্য দুইটি প্রাণী অর্থাৎ মানুষ ও শূকরের সাহায্য আবশ্যক করে। এখন ভাবিয়া দেখ, ইহারা কি ভীষণ জীব এবং কিরূপ ভাবে মানুষকে আক্রমণ করিয়া মৃত্যু-মুখে অগ্রসর করিয়া দেয়।



২। লম্বা ক্রিমি (Nemertinea)

এই জাতীয় ক্রিমি আকারে খুব লম্বা হয়। ইহাদিগকে সমুদ্রের নোনা জলে, সমুদ্রতীরে, সাদা জলে এবং মাটিতে জন্মিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বর্ণ বেশ মনোরম। যে সমস্ত সমুদ্রজাত উদ্ভিদের সঙ্গে ইহারা সাধারণতঃ বাস করে, ইহারা দেখিতে তাহাদেরই অনুরূপ হইয়া থাকে। ইহারা এক ইঞ্চি হইতে ষাট হাতেরও অধিক লম্বা হইয়া থাকে নীচশ্রেণীর প্রাণীর ভিতর ইহাদের দেহেই প্রথমতঃ লাল রংএর রক্ত-কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও পরাঙ্গভোজী জীব। ইহাদের

দেহের ভিতরে কোন খাদ্যনলী থাকে না। ইহারা আশ্রয়দাতা প্রাণীর খাদ্য-ভাণ্ডারের ভিতর বসিয়া থাকিয়া সমস্ত দেহের উপরিভাগ দ্বারা খাদ্য

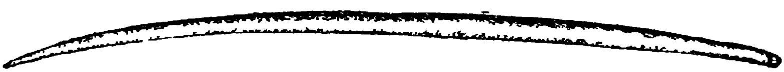


লম্বা ক্রিমি

শোষণ করে। ইহাদের বাচ্চা আকারে খুব ছোট হইলেও দেখিতে সম্পূর্ণ পিতামাতারই অনুরূপ। কোন কোন সময় ইহারা খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু বাচ্চার উৎপাদন করিয়া থাকে।

৩। সূত্রাকারের ক্রিমি (Nemathelminthes)

মানুষের, বিশেষতঃ শিশুদিগের পেটের ভিতরে যে ছোট ছোট কৃমি জন্মিয়া থাকে ইহারাই এই সূত্রাকারের ক্রিমির উদাহরণ। এ ছাড়া শ্লীপদ



ক্রিমি

অর্থাৎ পাফোলা প্রভৃতি কতকগুলি রোগ-উৎপাদক কীটও এই শ্রেণীর জীব। ইহাদের দেহে কোন রকমের গ্রন্থি থাকে না। পুং-স্ত্রী ভেদে ইহাদের মধ্যে দুই রকমের কীটই দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থিযুক্ত কীট

(Annelids)

তোমাদের নিতান্ত পরিচিত কেঁচো এবং জলৌকা বা জোঁক ইহাদের উদাহরণ। কেঁচোর চলাফেরা এবং জোঁকের রক্তশোষণ জন্য বিশেষ অঙ্গ থাকার দরুণ ইহাদিগকে আবার দুই পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে কেঁচোর দেহের নীচের দিকে যদি অঙ্গুলী দ্বারা আস্তে আস্তে স্পর্শ কর তবে কাঁটা কাঁটা বোধ হইবে। এই কাঁটাগুলিই ইহাদের পা। ইহাদেরই সাহায্যে ইহারা মাটির উপর চলাফেরা করে। এজন্য ইহাদিগকে কণ্টকপাদ (Chaetopods) বলা হয়। জোঁকের মুখে রক্ত-শোষণ যন্ত্র থাকে বলিয়া তাহাদের নাম শোষণমুখ (Discophora)।

কেঁচো

কেঁচোর দেহে অঙ্গুরীর মত খণ্ড খণ্ড অংশগুলি তোমরা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পার। হয়ত তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহা ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছ। তাহারা চলিবার সময় তাহাদের দেহের যে ভাগ সম্মুখের দিকে থাকে তাহাই তাহাদের মুখ। মুখের বিপরীতদিকে অর্থাৎ পশ্চাদ্‌দিকের

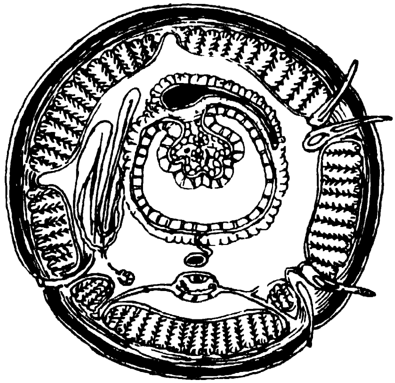


কেঁচো

ভাগে মলদ্বার থাকে। মাথার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে লক্ষ্য করিলেই খানিকটা যায়গা উঁচু দেখিতে পাইবে। ইহা পূর্ব্বোক্ত কতকগুলি অঙ্গুরী পরস্পর মিশিয়া গিয়া উৎপন্ন হয়। এখানেই পুং এবং স্ত্রী অঙ্গুরীর স্থান। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে নীচের দিকে অনুসন্ধান করিলে এই পুং ও স্ত্রী অঙ্গুরীর অবস্থান

বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং কেঁচো যে উভলিঙ্গ প্রাণী সে কথা বোধ হয় তোমাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না।

কেঁচোর মুখের কাছের কয়েকটি অঙ্গুরী ছাড়া, বাকী প্রায় প্রত্যেকটি অঙ্গুরীর নীচের দিকে, দুইপার্শ্বে, চামের ভিতর দিক হইতে দুই জোড়া খুব ছোট ছোট কাঁটার মত শুঁয়া বাহির হইয়া আসে। ইহারাই তাহাদের সেই পা, যাহার কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। তোমরা তাহা হাত দিয়া পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবে। এই শুঁয়ার আগাগুলির সাহায্যে মাটির উপরে চলিবার পক্ষে তাহাদের বিশেষ সুবিধা হয়। অধিকাংশ কেঁচোতেই—বিশেষতঃ যখন কচি থাকে—পিঠের দিকে চামের নীচে একটি লম্বা রক্তবর্ণের রেখা থাকে। তোমরা ইহা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে। ইহাই তাহাদের দেহে পিঠের দিকে রক্তের শিরা বা নলী। কেঁচোর দেহ দুইটি নল দ্বারা গঠিত। ভিতরের নল বাহিরের নলের চাইতে খুব সরু। এই দুই নলের মধ্যভাগে যে ফাঁক থাকে তাহার ভিতরেই পরিপাক যন্ত্র, রক্তের ধমনী ও মূত্রনালী ইত্যাদি বিন্যস্ত থাকে।



কেঁচোর দেহের ভিতরকার অবস্থা

কেঁচোর ডিম এবং বীজ গুটির ভিতরে আবদ্ধ থাকে। ইহারা বীজ এবং ডিমপূর্ণ গুটি প্রসব করে এবং মাটির কিঞ্চিৎ নীচেই পুঁতিয়া রাখে। সেখান হইতে ছোট ছোট বাচ্চা বাহির হয়। কোন কারণে একটি কেঁচো দ্বিখণ্ড হইয়া গেলে, তাহাদের প্রত্যেক খণ্ডই ক্রমশঃ বড় হইয়া নূতন কেঁচোর আকার ধারণ করে। এইরূপেও একটা কেঁচো হইতে দুইটা কেঁচোর জন্ম হইতে দেখা যায়।

ছোট-বড় নানা আকারের কেঁচোই তোমরা দেখিয়াছ। পাহাড়ের

উপর একপ্রকার কেঁচো জন্মে, তাহা প্রায় দুই ফুট লম্বা হইতে দেখা যায়। পাহাড়ের উপর বৃষ্টির জল পড়িলেই ইহারা সাধারণতঃ বাহির হইয়া থাকে।

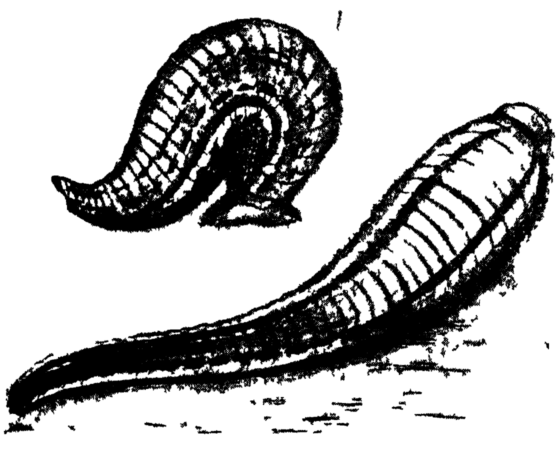
কেঁচো প্রভূত পরিমাণে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে মাটিই ইহাদের খাদ্য। মাটির সঙ্গে যে পচাগলা উদ্ভিদ্ থাকে, তাহা তাহারা দেহের পোষণের জন্য রাখিয়া বাকী অংশ পরিত্যাগ করে। তোমরা একটু লক্ষ্য করিলেই জমির উপর স্থানে স্থানে সূতার মত মাটির গোছা জমা দেখিতে পাইবে। ইহাই কেঁচোর পরিত্যক্ত মাটি। কেঁচো মাটিতে যে গর্ত্ত করিয়া থাকে, তাহার সাহায্যে মাটির ভিতরে বাতাস এবং বৃষ্টির জল প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। তাহারা নীচের মাটি উপরে তুলিয়া একপ্রকার চাষের কাজও করিয়া থাকে। যে কেঁচোকে তোমরা ঘৃণা কর, দেখ তাহা কত বড় একটা উপকারী প্রাণী।

জলৌকা বা জোঁক

তোমাদের মধ্যে যাহারা পুকুরে স্নান করিয়া থাক, তাহারা হয়ত অনেকেই জোঁক দেখিয়াছ। স্থলচর জোঁকও আছে, কিন্তু তাহারা ইহার মত আকারে তত বড় হয় না। এ ছাড়া সমুদ্রেও জোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। জলচর জোঁকের রং উপর দিকে মেটে কাল, কিন্তু নীচের দিকে লালাভ। জোঁকের দেহও বহু অঙ্গুরীয়কাকার খণ্ডের সমবায়ে গঠিত হইয়া থাকে। ইহাদের দেহের ভিতরকার গর্ত্ত অপেক্ষাকৃত সরু। ইহা অতীব পিচ্ছিল এবং রক্তপিপাসু বলিয়া সকলেই ইহাকে ঘৃণা করে। তোমাদের পরিচিত জলচর কাল জোঁক অনেক সময় শরীরের দূষিত রক্ত শরীর হইতে বাহির করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তপান করিবার সময় ইহারা ইহাদের মুখ হইতে এক প্রকার পদার্থ নিঃসরণ করে, তাহাতে রক্ত কখনও জমিয়া যাইতে পারে না, সুতরাং জোঁক রক্তপান করিয়া পড়িয়া গেলেও, কিছুকাল ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। সাধারণতঃ যদিও ইহাদিগের চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহাদের

শরীরের অগ্রভাগ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি চক্ষুই দেখিতে পাইবে, সুতরাং ইহাদিগকে অন্ধ বলা চলে না। কোন প্রাণী জলে নামিলেই ইহারা রক্তপান করিবার জন্য তাড়াতাড়ি ইহার দিকে ধাবিত হয়।

ইহাদের দেহের ভিতরে, রক্ত সঞ্চয় করিবার জন্য বহু কোষ আছে। রক্তপান করিবার পর জোঁক খুব মোটা হয়। এই মোটা হওয়ার অর্থ এই যে, ইহাদের দেহের ভিতরকার কোষগুলি রক্তের দ্বারা একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এরূপ ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়ার পরে জোঁকগুলি আপন হইতেই জীবজন্তুর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়। এইরূপে একবার রক্তপান করিলে তাহাদের অনেক দিন আর খাদ্যের দরকার হয় না।



জলচর জোঁক

অনেকে ভুল করিয়া জোঁকের দুইটি মুখ বলিয়া থাকে। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। জোঁকের মুখ একটি, তাহাতে তাহার অভিনব দাঁতগুলির বিন্যাস-প্রণালীতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। কোন স্থান জোঁকে কামড়াইলে পর তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে যে, তিনটি রেখা তিনদিক হইতে আসিয়া একটি মধ্যবিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। ইহাদের চোয়ালে যে তিন সারি দাঁত আছে ইহা তাহাদেরই চিহ্ন। ইহাদের দেহের অন্য প্রান্ত দ্বারা ইহারা শুধু প্রাণীদেহের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়াই থাকিতে পারে,

এছাড়া মুখের অন্য কোন কাজই করিতে পারে না ; সুতরাং তাহাকেও মুখ বলা নিতান্ত ভুল।

জোঁকের দেহে হাড়ের কোন চিহ্নও নাই। ইহারা ইচ্ছামত খাট ও লম্বা হইতে পারে। জলে ইহারা এলোমেলো ভাবে খুব দ্রুত সাঁতার কাটে। জলাশয়ের জল শুকাইয়া গেলেও ইহারা পাঁকের নীচে অনেকদিন জীবিত থাকে। পাঁকের ভিতর গর্ত্ত খুঁড়িলে অনেক সময় এরূপ জীবিত জোঁক দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারাও কেঁচোর মত উভলিঙ্গ প্রাণী। মর্দ্দা কিংবা মাদী বলিয়া ইহাদের মধ্যেও কোন তফাৎ নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

খণ্ডিতাঙ্গ পোকামাকড়

(Arthropoda)

এই শ্রেণীর ইতরপ্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড গ্রন্থিবদ্ধ অংশদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া ইহাদের এই নাম দেওয়া হইয়াছে। জীবজগতে যত রকম প্রাণী আছে তাহাদের মধ্যে এই শ্রেণীর ইতরপ্রাণীর সংখ্যা সকলের চাইতে অধিক। আবিষ্কৃত একমাত্র পোকাজাতীয় প্রাণীর সংখ্যাই তিন লক্ষেরও বেশী। এখনও মনে হয় যেন, এই শ্রেণীর বহুপ্রাণী অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। ইহারা সংখ্যায় এত অধিক বলিয়া বহু বিভিন্ন আকারের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহ দুইপার্শ্বে সমভাবে বৃদ্ধি হইয়া গঠিত হয়। দেহে যে কয়েকটি খণ্ড থাকে তাহার প্রত্যেকটির দুইপার্শ্বে একটি একটি করিয়া দুইটি প্রত্যঙ্গ থাকে। এই প্রত্যঙ্গগুলিকে সাধারণতঃ পা বলিয়া ধরা হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি দ্বারা, হাটা ছাড়া অন্য কাজও করা হইয়া থাকে। সম্মুখভাগে যে একজোড়া প্রত্যঙ্গ থাকে, তাহা এরূপভাবেই গঠিত যে, তাহার সাহায্যে এই সকল প্রাণী অনায়াসে খাদ্যদ্রব্য ধরিয়া এবং চূর্ণ করিয়া খাইতে পারে। ইহাদের দেহের বহিরাবরণ অর্থাৎ খোলস কিউটিন (cutin) নামক এক প্রকার অদ্ভুত যৌগিক পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। দেহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বার বার নিয়মিতভাবে এই খোলস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাদের স্নায়ু মাথার পিছনদিকে অঙ্গুরীয়কাকার মগজে পরিণত হয়। এই সকল প্রাণীর মধ্যে কিন্তু পুং-স্ত্রী ভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ প্রাণীই খুব কর্ম্মনিপুণ। চিংড়িমাছ, কর্কট বা কাঁকড়া, চেলা, কঁ্যাড়া, বইয়ের রূপালী পোকা, আরশুলা, নানারকম মাছি, মৌমাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, কাঁচ পোকা, ছোট বড় নানা আকারের পিপীলিকা, শস্যহানিকারক পতঙ্গ,

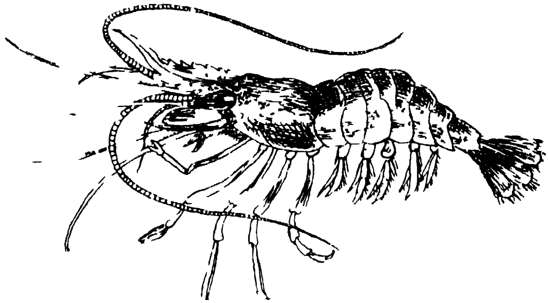
করলা-ফড়িং, মাথার উকুণ, ছারপোকা, প্রজাপতি, মথ, বৃশ্চিক এবং যত রকম মাকড়শা আছে, ইহারা সকলেই এই খণ্ডিতাঙ্গ পোকামাকড় শ্রেণীরই অন্তর্গত। ইহাদের আকারগত সাদৃশ্য দ্বারা ইহাদিগকে আবার পাঁচটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :—যথা (১) খোলসধারী (Crustacea), (২) কোমলচর্ম্মী (Onychophora), (৩) বহুপদী (Myripoda), (৪) ষট্‌পদী (Hexapoda), ও (৫) মাকড়শাবর্গ বা লূতাদিবর্গ (Arachnid)।

১। খোলসধারী কীট
(Crustacea)

খোলসধারী উপশ্রেণীর অন্তর্গত যে সকল প্রাণী আছে, তাহারা সমুদ্রের নোনা জলে এবং নদী, পুকুর, খাল, বিল প্রভৃতির সাদা জলে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় কোন কোন প্রাণী ডাঙ্গায়ও বাস করিয়া থাকে। তোমাদের পরিচিত চিংড়ি ও কর্কট বা কাঁকড়া এই উপ-শ্রেণীরই অন্তর্গত। ইহাদিগকে কেন যে খোলসধারী বলা হইল, তাহা তোমরা ইহাদিগের কঠিন খোলসের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে। এই খোলস কিন্তু আবার ভগ্নপ্রবণ। জলে বাস করে বলিয়া যদিও তোমরা ইহাদিগকে মাছ বলিয়া থাক, বাস্তবিক কিন্তু ইহারা মাছ নহে। ইহারা এক প্রকার পোকাজাতীয় প্রাণী। মাছ ইহাদের চাইতে বহু উচ্চস্তরের জীব। এই চিংড়ি এবং কাঁকড়ার গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করিয়াই এই উপশ্রেণীর বিশেষত্বগুলি তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে।

চিংড়ির দেহ—মাথা (cephalon), বক্ষঃস্থল (thorax) ও উদর (abdomen) প্রধানতঃ এই তিন অংশে বিভক্ত দেখিতে পাইবে। মাথার অংশে মুখ এবং তাহারই কাছে স্পর্শানুভবশক্তিযুক্ত একজোড়া শুঁয়া (antennae) আছে। খোলসের ভিতরে মাথা, বক্ষঃস্থল এবং উদর পরস্পর

সংলগ্ন। উদরের শেষ অংশই লেজের অংশ (telson)। চিংড়ি মাছের নীচের দিকের প্রত্যঙ্গগুলিকে তোমরা সাধারণতঃ পা বলিয়া থাক। পা বলিতে তোমরা যাহা বুঝ, বাস্তবিক কিন্তু সেই অর্থে তাহাদের সকলগুলিকে



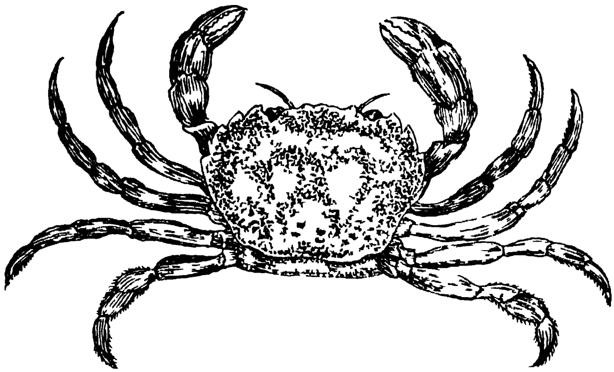
ছোট চিংড়ি

পা বলা চলে না। যে কতকগুলি চেপ্টা আঁশাল প্রত্যঙ্গ দেহের পিছন দিকে আছে তাহারা, এবং লেজের অংশ, জলে সাঁতরাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তা ছাড়া বাকিগুলির মধ্যেও সবগুলি হাঁটিবার পা-রূপে ব্যবহৃত হয় না। অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজ, যেমন খাদ্য মুখে তুলিয়া দেওয়া, কোন-কিছু ধরা ইত্যাদি কাজের জন্য ইহাদেরই মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট অঙ্গ আছে; সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ যে, ইহাদের সবগুলিকে পা বলা কখনই ঠিক নহে।

ইহাদের করাতের মত দাঁতবিশিষ্ট খড়্গের দুইধারে চক্ষু দুইটির প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহারা যে বোঁটাযুক্ত, এই বিশেষত্বটুকু নিশ্চয়ই তোমাদের চক্ষে পড়িবে। ইহারা জলে বাস করে বলিয়া ইহাদের ফুল্‌কোর (gills) সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে হয়।

চিংড়ির সঙ্গে কাঁকড়ার পার্থক্য যে কত বেশী, তাহা তোমরা সকলেই জান। কেন না তোমরা কেহই, ইহাদিগকে দেখ নাই এ কথা বলিতে পারিবে না। কাঁকড়ার মস্তক ও বক্ষঃস্থল পরস্পর মিশিয়া এক হইয়া যায়। ইহা বেশ বিস্তৃত গর্তের আকার প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে তাহাদের শ্বাস-

যন্ত্র, অর্থাৎ ফুল্‌কোগুলি থাকিবার স্থান হয়। ইহার নীচের দিকে গর্ত্তের ভিতরে কতকটা ত্রিকোণাকার অপেক্ষাকৃত ছোট উদর থাকে। মাদী কাঁকড়ার উদর যাও একটুকু বিস্তৃত, মর্দ্দা কাঁকড়ার উদর কিন্তু একেবারেই



কর্কট বা কাঁকড়া

অপ্রশস্ত। মর্দ্দা কাঁকড়ার উদরে মাত্র দুইজোড়া প্রত্যঙ্গ থাকে। মাদী কাঁকড়ার উদরে তাহার সংখ্যা দ্বিগুণ অর্থাৎ চারি জোড়া। ইহারই সাহায্যে তাহারা তাহাদের ডিমগুলি বহন করে। তাহারা তাহাদের বোঁটা-সংযুক্ত চক্ষুগুলি গর্ত্তের ভিতরে গুটাইয়া রাখিতে পারে। চিংড়ি মাছের চোখ এরূপভাবে গুটাইয়া রাখিবার কোন ব্যবস্থা নাই। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ইহাদের যে দুইটি দাঁড়া আছে, তাহা ইহাদের দেহের অনুপাতে খুবই বড়।

কচি অবস্থায় কাঁকড়ার বাচ্চা দেখিতে তাহার মাতাপিতার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের থাকে। এসময় ইহারা ঘন ঘন খোলস ত্যাগ করে এবং নানা রকম আকার ধারণ করে। তারপর মাতাপিতার মত পূর্ণাঙ্গ হইলে, আকারে ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে এবং বার বার খোলস ত্যাগ করিতে থাকে। যে সকল প্রাণী খোলস ত্যাগ করে, তাহারা খোলস ত্যাগের সময় সাধারণতঃ বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কাঁকড়ার পক্ষে

ইহা আবার এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। খোলস ত্যাগের সময় অনেক কাঁকড়া মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। কাঁকড়ার দেহ খোলসের ভিতরে যেমনই বড় এবং মোটা হইয়া পড়ে, অমনি খোলস ত্যাগ না করিয়া তাহার আর উপায় নাই। যেরূপেই হউক তাহাকে খোলসের বাহিরে আসিতেই হইবে। ইহারা কিরূপে বাহির হইয়া আসে তোমরা হয়ত তাহা বুঝিতে পার নাই। তাহাদের এই শক্তি তাহারা স্বভাবতঃই প্রাপ্ত হয়। একরূপ পুষ্ট কাঁকড়া তাহার মাংসল অংশ ভিতর দিকে টানিয়া লয়। ভিজা বলিয়া মাংসল অংশ অপেক্ষাকৃত সরু হইয়া, এমন কি পায়ের গ্রন্থির ভিতর দিয়াও বাহির হইয়া আসে। সেই কোমল দেহের উপর ক্রমশঃ নূতন খোলসের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ তাহাদের নূতন খোলস কোমলই থাকিয়া যায়। তখন তাহারা অতি কষ্টে গর্ত্তের ভিতরে ঢুকিয়া কোন-মতে আত্মরক্ষা করে। এসময় অন্য যে কোন কাঁকড়া তাহাদিগকে বধ করিয়া খাইয়া ফেলিতে পারে। নূতন খোলস কঠিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাঁকড়ার, কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েকদিন সময়ের দরকার হয়।

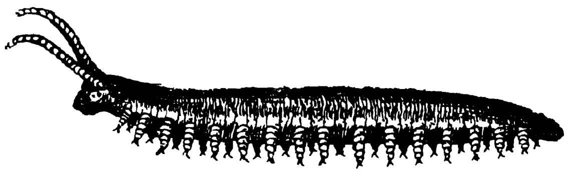
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক প্রকার কাঁকড়া আছে, তাহারা সমুদ্র হইতে দুই তিন মাইলের পথ দূরে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দলে দলে চলিয়া যায়। রাস্তায় দেওয়াল, কিংবা ঘর যাহাই থাকুক না কেন, তাহারা তাহা অতিক্রম করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। মাদী কাঁকড়ার ডিম পাড়িবার সময় হইলে, তাহারা ফিরিয়া আসে এবং সমুদ্রের বালিতে ডিম পাড়ে। চলিবার সময় তাহারা সোজা চলিয়া যাইবে, যদি তাহাতে তাহাদের মধ্যে শত শত কাঁকড়ারও মৃত্যু ঘটে, তবুও তাহারা পিছুপাও হইবে না। কোন কোন কাঁকড়া যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। তপস্বী কাঁকড়া (hermit crab) নামক এক প্রকার সমুদ্রজাত কাকড়া আছে, তাহারা শামুকের খোলার ভিতর বাস করিয়া থাকে।

চিংড়ি ও কাঁকড়ার মাথায় যে সুখাদ্য পদার্থ থাকে, তাহা তোমরা অনেকেই ভুল করিয়া, মগজ বলিয়া থাক। বাস্তবিক কিন্তু ইহা মগজ

নহে, উহা ইহাদের যকৃৎ। আর যে কাল পদার্থ ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা ইহাদের উদর হইতে নিঃসৃত অনাবশ্যক অপরিষ্কার মল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২। কোমলচর্ম্মী কীট
(Onychophora)

এই শ্রেণীর পোকার একটিমাত্র উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম পেরিপিটাস (Peripatus capansis)। ইহা ভারতবর্ষেও দেখিতে



পেরিপিটাস

পাওয়া যায়। আবর অভিযানের (Abor Expedition) সময় ইহা হিমালয় পর্ব্বতে পাওয়া গিয়াছিল।

ইহা দেখিতে একরকম লম্বা কীটের মত এবং লম্বায়ও প্রায় দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। ইহার দেহের চর্ম্ম মসৃণ এবং তাহাতে গ্রন্থির কোন চিহ্নও নাই; মাথায় দুইটি স্পর্শানুভবশক্তি সম্পন্ন শুঁয়া আছে, মুখে দুইটি চোয়াল এবং পিচ্ছল পদার্থ নিঃসরণকারী দুইটি গণ্ডমালা (papillae) থাকে। ইহার পাগুলি খাট এবং অসম্পূর্ণরূপে গ্রন্থিবদ্ধ। প্রত্যেক পায়ের অগ্রভাগেই দুইটি করিয়া পাখীর নখের মত নখ আছে। পায়ের সংখ্যা বহু, তাহারা দেহের দুইধারে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে জোড়ায় জোড়ায় সাজান থাকে। এই পায়ের উপরেই ইহাদের মূত্রনালীর স্থান। ইহারা খুব তাড়াতাড়ি চলিতে পারে।

শ্বাসপ্রশ্বাসেব জন্য ইহাদের বহুশাখাযুক্ত নল আছে। পেরিপিটাসের দেহে এই মূত্রনালী ও শ্বাসনালী থাকার দরুণই ইহাবা প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের এত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

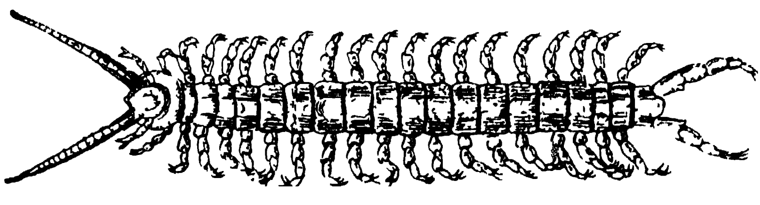
ইহাবা সাধারণতঃ রাত্রিকালেই বাহির হয় এবং পচাগলা কাঠ অথবা পাতার নীচে থাকিতেই ভালবাসে। মুখ হইতে নির্গত পিচ্ছল পদার্থদ্বারা যে সকল ক্ষুদ্রপ্রাণী তাহাবা বন্দী করিতে পারে, তাহা খাইয়াই তাহারা জীবণ ধারণ করে। ইহাদেব বাচ্চা ডিম্ব হইতে উৎপন্ন না হইয়া এমনি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩। বহুপদী কীট

(Myriapoda)

এই শ্রেণীব প্রাণী আমাদেব দেশে বহু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আবাব দুই জাতীয় প্রাণী আছে; যথা—শতপদী (centipodes) এবং সহস্রপদী (milipodes)। বাস্তবিক পক্ষে ইহাদেব পরস্পর যে খুব নিকট সম্বন্ধ আছে তাহা নহে। কিন্তু আকাব গত সাদৃশ্যেব দরুণই ইহাদিগকে একই শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

বিছা বা চেলা তোমবা অনেকেই দেখিয়াছ। ইহাই শতপদীব



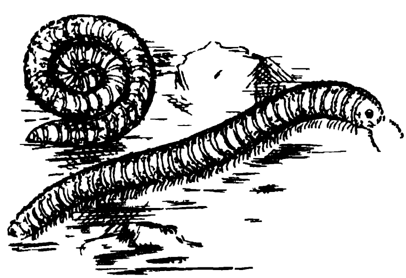
চেলা

উদাহরণ। এখানে শত অর্থ অনেক। ইহারা শতপদী এই উপশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেই যে ইহাদের একশত পা থাকিতে হইবে তাহার কোন

অর্থ নাই। সেইরূপ সহস্রপদীর অর্থও একহাজার পা-যুক্ত প্রাণী নহে। পায়ের সংখ্যা একহাজারের কম হইলেও কিছু আসে যায় না। মোটকথা তাহাদের পায়ের সংখ্যা, শতপদীর চাইতে বেশী। আমাদের দেশে কঁ্যাড়া তোমরা প্রায় সকলেই দেখিয়াছ। ইহারাই সহস্রপদীর উদাহরণ। ইহারা উভয়েই স্থলচর। চেলা কিংবা কঁ্যাড়া কখনও জলে দেখিতে পাইবে না।

শতপদী চেলা মাংসাশী এবং বিষাক্ত। ইহাদের আকার সাধারণতঃ চেপ্টা। মাথার সম্মুখভাগে স্পর্শানুভবশক্তি সম্পন্ন বহুগ্রন্থিযুক্ত যে দুইটি শুঁয়া থাকে, তাহা তোমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে। ইহাদের দেহে প্রত্যেক খণ্ডের দুই দিকে দুইটি করিয়া গ্রন্থিবদ্ধ পা আছে। ইহাদের মুখে দুইটি চুয়াল থাকে। তাহার নীচের দুইটি পা বিষাক্ত কাঁটাতে পরিণত হয়। উহারই সাহায্যে ইহারা দংশন করিয়া থাকে। একটি বড় চেলা একফুট পর্য্যন্ত লম্ব হইতে দেখা যায়। বিষাক্ত দংশনের জন্য লোকে ইহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকে। ইহারা সূর্য্যালোক মোটেই পছন্দ করে না। এজন্য দিনের বেলা ইট-পাটকেলের তলায় লুকাইয়া থাকে।

সহস্রপদী কঁ্যাড়া উদ্ভিদ্‌ভোজী এবং শান্ত। তাহাদের দেহ নলের মত গোলাকার এবং বহুখণ্ড গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক খণ্ডের দুইধারে দুইখানা করিয়া চারিখানা পা থাকে। ইহাদেরও মাথার সম্মুখে স্পর্শানুভবশক্তি সম্পন্ন দুইটি গ্রন্থি-যুক্ত শুঁয়া আছে। ইহাদের দংশন করিবার জন্য বিষাক্ত কোন কাঁটা নাই। সাধারণ চেলার গায়ের রং লাল। খুব বড় কঁ্যাড়া একফুট লম্বা হইতেও দেখা যায়। কঁ্যাড়া স্পর্শ করিলেই দেখিতে পাইবে যে, তাহারা ঘড়ীর স্প্রিংএর মত কুণ্ডলী পাকাইয়া মৃতের মত ভাণ করিয়া থাকে ;



কেন্নো বা কঁ্যাড়া

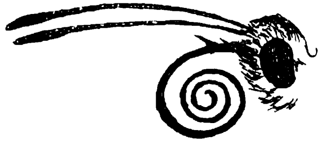
আবার একটু পরেই চলিতে আরম্ভ করে। ইহারা সূর্য্যালোকে বাহির হইতে কোনই অসুবিধা বোধ করে না। আমাদের দেশের কাঁচা ঘরের খড়ের চাল, বর্ষার জলে যখন পচিতে আরম্ভ করে তখন তাহা হইতে বহু ছোট ছোট লাল-রংয়ের কাঁ্যাড়া বাহির হইয়া থাকে। তোমরা একটু লক্ষ্য করিলেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে। যদিও ইহাদের বিষাক্ত কোন কাঁটা নাই, তবুও ইহাদের দেহ একেবারে নির্ব্বিষ নহে। কচি খোকাখুকী ইহার লাল রংএ আকৃষ্ট হইয়া, যদি ইহার একটাকে হঠাৎ মুখে দেয়, তবে মুখের ভিতর ঘা হইয়া যায়।

৪। ষটপদী কীট

(Insecta or Hexapoda)

এই শ্রেণীর পোকার দেহে দুইটি লক্ষণই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। একটি তাহাদের সরু কটীদেশ বা মাজা, অন্যটি তাহাদের গ্রন্থিযুক্ত ছয়টি পা। প্রথম লক্ষণটি যদিও এই শ্রেণীর কোন কোন প্রাণীতে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অন্য লক্ষণটি, অর্থাৎ গ্রন্থিযুক্ত ছয়টি পা, এই শ্রেণীর সকল পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতেই বিদ্যমান্ থাকে। ইহাদের কীটডিম্বের পায়ের সংখ্যার ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম নাই, সাধারণতঃ ছয়টির বেশীই দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর সকল প্রাণীরই পুং-স্ত্রী ভেদে দুইরকম পোকা থাকে। ইহাদের মধ্যে ভূচর ও খেচর পোকার সংখ্যাই খুব বেশী, জলচরের সংখ্যা খুব কম। অবশ্য ইহাদের মধ্যে বহু পোকার কীটডিম্ব জলেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাদের বায়ুনালী আছে। ইহার সাহায্যেই তাহারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

ষট্‌পদী পোকার দেহেও অন্যান্য খণ্ডিতাঙ্গ পোকার ন্যায খণ্ড খণ্ড অংশ পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ। এই খণ্ডগুলি প্রায সকল ক্ষেত্রেই খুব ছোট ছোট। চিটিন (chitin) নামক পদার্থে ইহাদের বহিরাবরণ গঠিত হয এবং ইহারা সময়মত খোলস পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাদের পিছনদিকের মগজের সহিত একটি কঠিন মালাকারের স্নায়ু সংলগ্ন থাকে (ganglia)। পূর্ণাঙ্গ হইলে এই শ্রেণীর অধিকাংশ প্রাণীর বক্ষের তুইধারে পাখার উৎপত্তি হয। ইহাদেরও মাথায় একজোড়া স্পর্শানুভবশক্তি সম্পন্ন শুঁযা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রকম কাজের সুবিধার জন্য এই সকল পোকার মুখের গঠন সচরাচর চারি প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা হযতঃ তোমরা বুঝিতে পার নাই। তোমাদের পরিচিত উদাহরণ দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। (১) আরশুলা ও গোবরে পোকা প্রভৃতির মুখ যদি পরীক্ষা কর তবে দেখিতে পাইবে যে, তাহাতে কামড়ানের সুবিধা রহিয়াছে। (২) প্রজাপতির মুখে লম্বা কুণ্ডলীপাকান শোষণযন্ত্র একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায। (৩) মশা ও ছারপোকার মুখে শোষণ এবং বিদ্ধ করার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা তোমরা সকলেই জান। (৪) মৌমাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল প্রভৃতি তাহাদের মুখ দ্বারা কামড়ান এবং শোষণ



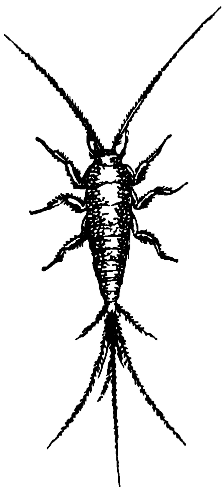
প্রজাপতির মাথা

এই উভযকার্য্যই করিয়া থাকে। একথা এখানে বলা আবশ্যক যে, ইহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগস্থিত হুলের দংশনই কিন্তু বিষাক্ত এবং যন্ত্রণাদাযক। মুখের চাইতে তাহাদের হুলের ভয বেশী। ইহাদের মুখে সাধারণতঃ তিন জোড়া প্রত্যঙ্গ আছে। কাজ অনুসারে এই সকল প্রত্যঙ্গের গঠনে তারতম্য হয—মুখের সম্মুখে যে তুইটি থাকে, তাহারা সাধারণতঃ দংশনাস্ত্র (mandible) ও অন্য তুইজোড়া ইহাদের চাপার চুয়াল (maxillae) রূপে ব্যবহৃত হয। ইহাদের প্রত্যেকেরই মাথায তুইটি অপেক্ষাকৃত বড় বড় চক্ষু থাকে বুকের অংশেও তিনটি খণ্ড এবং প্রত্যেক

খণ্ডেই এক জোড়া করিয়া পা দেখিতে পাওয়া যায়। পাখা থাকিবার মত হইলে, শেষের দুইটি অংশে পা ছাড়া পাখারও উৎপত্তি হইয়া থাকে। উদরের আর কোন প্রত্যঙ্গ জন্মে না। শুধু যাহাদের হুল আছে, তাহাদের উদরের শেষ অংশে একটি করিয়া হুলের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের পোকার সংখ্যা এত অধিক যে, প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাণিতত্ত্বের মধ্যে কীটতত্ত্ব (Entomology) নামে আর একটি বিশেষ শাখার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি পোকা, তাহাদের খাওয়া-পরা, গৃহনির্ম্মাণ, সন্তানপালন ও শৃঙ্খলারসহিত একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার বিষয়ে, এরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকে যে, তাহা দেখিলে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এ সকল বিষয়ে তাহাদের নিকট হইতে, এমন কি মানুষেরও অনেক কিছু শিখিবার আছে।

এই অসংখ্য পোকার বিষয় আলোচনা করিতে হইলে ইহাদিগকে শ্রেণীবিভাগ না করিয়া, আলোচনা করা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রেণীবিভাগের জন্য ইহাদের পাখার অভাব, অবস্থান, প্রকৃতি এবং গঠনের উপর নির্ভর করিলেই সুবিধা হইবে। এইরূপে ইহাদিগকে আট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।



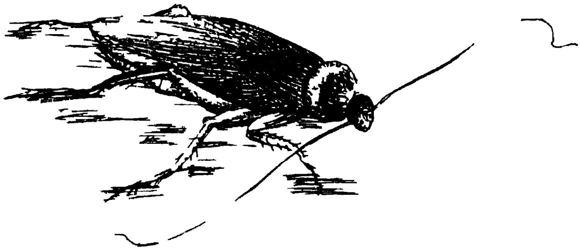
রূপালী কাট

পাখাহীন (Aftera)

পাখাহীন পোকার সংখ্যা খুবই কম। তাহাদের মধ্যে বইয়ের রূপালী কীট (Silver fish) তোমাদের খুবই পরিচিত। ইহারা দেরাজের ভিতরে কাগজ, কাপড়—যাহা পায় তাহাই কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহার দেহ রূপালী রঙের আঁইসে আবৃত বলিয়া ইহার এই নাম রাখা হইয়াছে। ছবির দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহাতে পাখা ছাড়া ষট্‌পদী পোকার অন্ততঃ কতকগুলি চিহ্ন স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে।

সরলশিরা-পাখাধারী (Orthoptera)

এই উপশ্রেণীর অন্তর্গত বহু পোকাই তোমাদের পরিচিত। আরশুলা, ফড়িং (Grasshoppers), গঙ্গা-ফড়িং (Mantis), উৎকুঙ্গা (Mole cricket) ঝিল্লী, ঝিঁ ঝিঁ পোকা, নানা রকম পঙ্গপাল (Locust), কাল পোকা (Earwig) প্রভৃতি। আরশুলা যে আবার এই সকল নানা রকম ফড়িংএর জ্ঞাতি ভাই, তাহা হয়ত তোমরা বিশ্বাসই করিতে চাইবে না। বাস্তবিক কিন্তু উহারা গৃহফড়িং ছাড়া আর কিছুই নহে। আরশুলা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহাদের শরীরে, দুর্গন্ধ তরল আঁটা সংযুক্ত থাকাতে, তোমরা

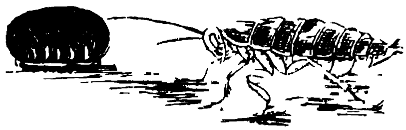


আরশুলা।

কেহই ইহাকে স্পর্শ করিতে চাও না। অথচ ফড়িং ধরিতে তোমরা কেহই পিছুপাও হইবে না। আরশুলা যখন তোমরা সর্ব্বদাই দেখিয়া থাক, তখন ঘৃণ্য প্রাণী হইলেও তাহার বিষয় তোমাদের কিছু কিছু জানা থাকা কর্ত্তব্য। কোন-কিছু দেখিতে ঘৃণা করে বলিয়াই প্রকৃতপক্ষে তাহা ঘৃণার জিনিষ হইতে পারে না। আরশুলাকে তোমরা ঘৃণা কর বটে, কিন্তু চীনদেশবাসীরা আবার তাহাকে পরম উপাদেয় খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করে। তারপর এইরূপ ঘৃণা দূর করিতে না পারিলে ইতরপ্রাণীর বিষয় বহু অভিনবতত্ত্বই তোমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। সাবান দ্বারা হাত ধুইলেই যত রকম অপরিষ্কার এবং দুর্গন্ধ যখন দূর হইয়া যায়, তখন আর ভাবনা কি? এই ঘৃণা একবার দূর করিতে পারিলেই পরে আর কোন অসুবিধা বোধ করিবে না।

আরশুলা একটি ভারতীয় প্রাচীন ইতরপ্রাণী। এখান হইতেই জাহাজে চড়িয়া ইহারা বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য চীনদেশ ছাড়া আর কোন দেশেই ইহাদিগকে কেহ যত্ন করিয়া নিয়া যায় নাই, নিজেরাই বিদেশী যাত্রীর বাক্স, পেটরা ইত্যাদির ভিতর লুকাইয়া নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছে।

লক্ষ্য করিয়া দেখিও ইহার মাথা এবং দেহ—গ্রীবা বা গলা দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। মাথায় চুলের মত লম্বা এবং সরু স্পর্শানুভবকারী শুঁড় দুইটি প্রথমেই তোমাদের চক্ষে পড়িবে। তারপর ইহাদের বেশ বড় এবং কাল দুইটি মিশ্রচক্ষু যদি পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে তাহাতে বহু ষড়ভুজাকৃতি পল বা ফলা দেখিতে পাইবে। ইহাদের উপরের ঠোঁট (labrum) সম্মুখদিকে কিঞ্চিৎ বাড়ান। তাহার নীচে ইহাদের যে দুইজোড়া চুয়াল আছে, তাহা তাহারা এদিক-ওদিক নাড়া-চাড়া করিতে পারে। তাহাদের মধ্যে আবার শেষের দিকের চুয়াল জোড়া, নীচের ঠোঁটের (labium) সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বুকের তিনটি খণ্ডের প্রথমটি (protothorax) অন্য দুইটি খণ্ড হইতে পৃথক্ থাকে, এবং তাহা হইতেই সম্মুখের পা দুইটি বাহির হয়। মধ্যের খণ্ডটি (mesothorax) হইতে দুইটি পা এবং উপরের দিকে দুইটি অপেক্ষাকৃত কঠিন পালক জন্মিয়া থাকে। এই দুইটি পালক আরশুলার দেহে শুধু আবরণ স্বরূপ সংলগ্ন থাকে। বক্ষের শেষ অংশ (metathorax) যাহা উদরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে—তাহা হইতে পিছনদিকের বাকি দুইটি পা এবং উড়িবার জন্য আর দুইটি পাখা উৎপন্ন হয়। এই দুইটি পাখাই প্রকৃতপক্ষে পাখার কাজ করিয়া থাকে। আরশুলা কিন্তু তাহার ছয়টি সবল পায়ের সাহায্যে এত তাড়াতাড়ি দৌড়াইতে পারে যে, তাহাদের এই পাখারও বড় একটা ব্যবহার করিতে হয় না। ইহাদের উদরও ১০।১১টি খণ্ডে বিভক্ত থাকে। এই সকল খণ্ডের পিঠের দিক এবং বুকের দিক খোলস দ্বারা আবৃত

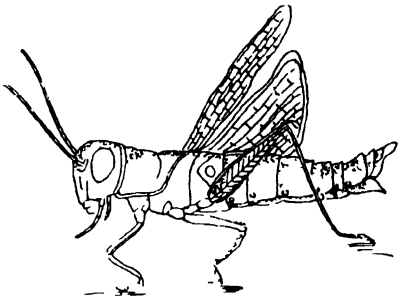


আরশুলার ডিম আরশুলার কীটডিম্ব

থাকে। স্ত্রী-আরশুলার উদরের শেষ অংশে মাত্র দুইটি শুঁয়া থাকে। পুং-আরশুলাতে আরও দুইটি অতিরিক্ত শুঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

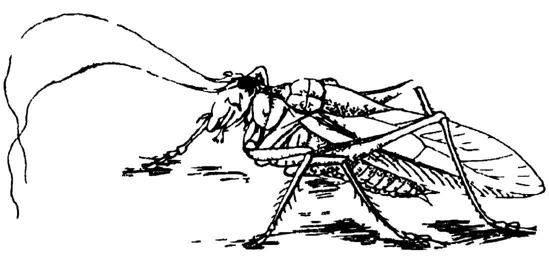
ইহাদের ডিম হইতে প্রথমতঃ কীটডিম্ব এবং কীটডিম্ব হইতে ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গ আরশুলার উৎপত্তি হয়।

এই উপশ্রেণীর অন্যান্য প্রাণীদিগের মধ্যে সাধারণ ফড়িং, গঙ্গা-ফড়িং, পঙ্গপাল ও উৎকুঙ্গা বা ঘুরঘুরে তোমরা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।



পঙ্গপাল

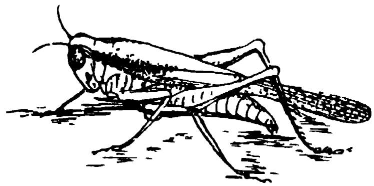
ইহাদের মধ্যে পঙ্গপাল শস্যের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকারী। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া কাল মেঘের ন্যায় আকাশপথে উড়িতে থাকে, এবং যে মাঠে অবতরণ করে, তাহা একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলে। কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তোমরা যেখানে শস্যপূর্ণ মাঠ দেখিয়াছ, পঙ্গপালের আক্রমণের পর সেখানে মরা খড়কুটা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। ইহাদের খাইবার সময় যে খস্‌খস্‌ শব্দ হয়, তাহাতেই কৃষকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ইহারা উড়িয়া যাইবার সময় শোঁ শোঁ শব্দ হয়, তাহা শুনিতে পাইলে, কৃষকগণ মাঠে আসিয়া খুব জোরে কেনেস্তারা বাজাইতে থাকে এবং এইরূপে ইহাদের আক্রমণ হইতে ক্ষেত রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।



বড়জাতীয় ফড়িং

বহু রকমের পঙ্গপাল এবং ফড়িং দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সিকি ইঞ্চি হইতে পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। স্ত্রী-পোকাগুলির গর্ত্ত করিবার যন্ত্র আছে, তাহারই সাহায্যে তাহারা মাটির

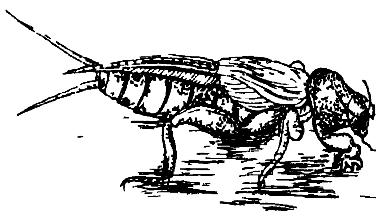
ভিতর গর্ত্ত করিয়া ডিম পাড়ে। ডিম হইতে যে বাচ্চা হয় প্রথমতঃ তাহাদের কোন পাখা থাকে না। তাহাদের ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল হয়। এই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য এইরূপ লক্ষ লক্ষ পোকা দল বাঁধিয়া সোজা পথে চলিতে থাকে। তাহাদের সম্মুখে ঘাস কিংবা শস্য যাহাই থাকুক না কেন তাহা খাইয়া মাঠকে মাঠ, একেবারে মরুভূমির মত উজাড় করিয়া চলিয়া যায়। তারপর পাখার উৎপত্তি হইলে তাহারা আকাশপথে দলে দলে উড়িতে থাকে, এবং শস্যপূর্ণ মাঠ দেখিলে অবতরণ করিয়া কৃষকের সর্ব্বনাশ সাধন করে। ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকার শস্য রক্ষা করিবার জন্য আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নানা রকম চেষ্টা করা হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে একটি এই যে, ইহারা যখন মাটির উপর হাটিয়া চলিতে থাকে, তখন কোন মসৃণ জিনিষ সম্মুখে পড়িলে ইহারা আর অগ্রসর হইতে পারে না। এজন্য ইহাদের সম্মুখে খুব লম্বা কাপড়ের একটি পর্দ্দা মাটি পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখা হয়। পর্দ্দার উপরদিকের অংশ অয়েল ক্লথের দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া ইহারা পর্দ্দা অতিক্রম করিতে পারে না, পিছলাইয়া নীচে পড়িয়া যায়। পর্দ্দার নীচে গর্ত্ত খোঁড়া থাকে, তাহার ভিতরে একবার পড়িয়া গেলে আর উপরে উঠিবার সম্ভাবনা নাই। কেননা গর্ত্তের সকল দিকের কিনারা মসৃণ দস্তার পাতে মোড়ান থাকে। সুতরাং অবিলম্বেই ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা অবশ্য খুবই ব্যয়সাধ্য, কিন্তু ইহাতে দেশের যে পরিমাণ উপকার হয়, তাহার তুলনায় খরচ তেমন কিছুই নয়। ঝড়ের মুখে পড়িলে কখনও কখনও ইহাদের লক্ষ লক্ষ পোকা একেবারে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে দেখা যায়। অবশ্য ইহা দৈবাৎই হইয়া থাকে। ইহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ আফ্রিকাতে একবার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেখানে বিশ হাজার বর্গমাইল স্থান পঙ্গপালের মৃতদেহে একেবারে ভর্ত্তি হইয়া



ছোটজাতীয় ফড়িং

গিয়াছিল। এখন ভাবিয়া দেখ, এই পঙ্গপালের সংখ্যাই পৃথিবীতে কি পরিমাণ হইতে পারে।

সাধারণ ফড়িং, উৎরুঙ্গা বা ঘুর্‌ঘুরে অবশ্য তত অনিষ্টকারী নহে, কিন্তু তাহাদেরও সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া মঙ্গলজনক নহে। সাধারণ ফড়িং এবং ক্ষেত-ঘুর্‌ঘুরে (field cricket) পঙ্গপালের জ্ঞাতিভাই হইলেও তাহাদের মত তাহারা তেমন কোন অনিষ্ট করে না। ইহাদের মধ্যে সাড়াশীধারী উৎরুঙ্গা বা ঘুর্‌ঘুরে (mole cricket) বড় অনিষ্টকারী।



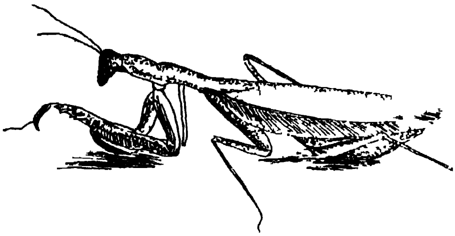
ক্ষেত-ঘুর্‌ঘুরে

ইহারা মাটির ভিতরে চারিদিকে নালা কাটিতে থাকে, সে সময় মাটির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অনেক গাছের শিকড়ও কাটিয়া ফেলে। ইহাতে বাগানের বিশেষ অনিষ্ট হয়। তাহারা আবার গাছের অনিষ্টকারী পোকা খাইয়া গাছের উপকারও করে। এখন ইহারা গাছের পক্ষে বেশীর ভাগ উপকারী কি অপকারী তাহা জমির অবস্থার উপর নির্ভর করে।

ইহারা সকলেই এক শ্রেণীর হইলেও পরস্পর একটু পার্থক্য আছে। পঙ্গপালের উদরের দুইধারে দুইটি বিস্তৃত অংশ থাকে। ফড়িংএর বেলা তাহা তাহার সম্মুখের দুপায়ের দুই দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। পঙ্গপালের স্পর্শানুভবকারী শুঁয়া (antennae) খুব খাট, কিন্তু ফড়িংএর বেলা তাহা বেশ লম্বা। ইহারা সকলেই ইহাদের খর্‌খরে পাখা পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করিতে পারে। ইহাদের পুং-পোকারই কিন্তু এরূপ শব্দ করিবার ক্ষমতা আছে, স্ত্রী-পোকার সে ক্ষমতা নাই। কারণ তাহাদের দরকারও নাই। পুং-পোকা এরূপ শব্দ করিয়া স্ত্রী-পোকাকে কাছে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া থাকে। স্ত্রী-পোকা সেই ইঙ্গিতে তাহার কাছে সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার শব্দ করিবার আর কোন দরকার নাই। তোমরা সময় সময় বিশেষতঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি

ঋতুতে মাটির ভিতরে অথবা গাছে নানা রকম রব শুনিতে পাও, তাহা এই শ্রেণীর পুং-পোকার স্ত্রী-পোকাকে আহ্বান করিবার সঙ্গীত বা সঙ্কেত।

ফড়িংএর মধ্যে গঙ্গা-ফড়িং (Mantis) খুবই উপকারী। ইহারা আকারে বেশ বড় হয়, এবং উদ্ভিদের অনিষ্টকারী অনেক পোকা খাইয়া ফেলে। ইহাদের সম্মুখের পা দুইটি এরূপ-ভাবে রাখে যে, দেখিলেই মনে হয় যেন তাহারা প্রার্থনা করিতেছে। ফড়িং, গঙ্গা-ফড়িং, পঙ্গপাল, উৎকুঙ্গা ঘুর্‌ঘুরে প্রভৃতি ইহারা সকলেই তাহাদের পিছনের লম্বা ঠ্যাং দুইটির সাহায্যে সজোরে লাফ্ দিতে পারে।



গঙ্গা-ফড়িং

জালাঙ্কিত পাখাযুক্ত পোকা (Neuroptera)

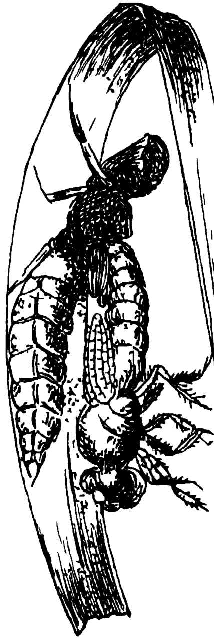
এই সকল পোকার দেহের দুইদিকে দুইটি দুইটি করিয়া চারিটি পাখা থাকে। এই পাখাগুলি সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ, তাহাতে শিরা-উপশিরার বিন্যাস-প্রণালী আবার এরূপ যে দেখিলে জালের মত মনে হয়। তোমাদের পরিচিত করলা-ফড়িং ও উলি এই উপশ্রেণীর উদাহরণ। এ ছাড়া ইহার অন্তর্গত আরও বহু পোকা, তোমরা অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে।

আমাদের দেশে নানা রং-বেরং-এর সুন্দর সুন্দর করলা-ফড়িং দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে হল্‌দে এবং লাল রংএর করলা-ফড়িংএর সংখ্যাই খুব বেশী। বর্ষাকালে জলের ধারেই ইহাদিগকে উড়িতে দেখা



করলা-ফড়িং

যায়। ইহারা জলের উপরিভাগে উড়িয়া বেড়াইলেও কিন্তু ইহাদের জন্ম জলের মধ্যেই হইয়া থাকে। মাদী করলা-ফড়িং জলের ধারে কিংবা জলের মধ্যে যে সকল ঘাস জন্মে, তাহার পাতার উপর বসিয়া জলেই ডিম পাড়িয়া থাকে। সেই ডিম হইতে যে কীটডিম্ব উৎপন্ন হয়, তাহা জলেই বর্দ্ধিত হয়। কীটডিম্ব পূর্ণাঙ্গ হইলে খোলস পরিত্যাগ করিয়া করলা-ফড়িংএর আকার ধারণ করে এবং জলের উপর বাতাসে উড়িয়া বেড়াইতে থাকে।



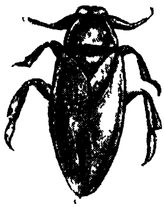
কীটডিম্ব হইতে করলা-ফড়িং বাহির হইতেছে

উই বা উলি কম বেশী প্রায় সকল যায়গাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা বোধ হয় প্রায় সকলেই উলি দেখিয়াছ। চলাফেরা এবং আকৃতিতে তাহারা অনেকাংশেই পিপীলিকার অনুরূপ হইলেও তাহাদের পাখার বিশেষত্বের দরুণ তাহারা করলা-ফড়িংএর সঙ্গে একই উপশ্রেণীর পোকা বলিয়া ধরা হইয়াছে। অবশ্য উলি এবং পিপীলিকা যে একই ষট্‌পদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই হিসাবে তাহারা একই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা বই, কাপড়-চোপড় ও ঘরের আসবাবপত্র একদিনের মধ্যেই একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। এজন্য ইহাদিগকে সকলেই ভয় করে।

অর্দ্ধপাখাযুক্ত পোকা (Hemiptera)

ষট্‌পদী শ্রেণীর অন্তর্গত ইহা আর একটি বড় উপশ্রেণী। এই উপশ্রেণীর বহু জলচর এবং স্থলচর পোকা তোমরা দেখিয়া থাক। ছারপোকা, উকুণ বা উৎকুণ (lice), গাছ উকুণ, জলচর গোবরে পোকা, রেণেত্রা (Ranatra) ও

অন্যান্য বহু পোকা ইহারই অন্তর্গত। ইহাদের সম্মুখের পাখার উপরের অর্দ্ধাংশ সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ, নীচের অর্দ্ধাংশ কঠিন। সাধারণতঃ এই উপশ্রেণীর অধিকাংশ পোকাতেই ইহা থাকে না। এই জন্যই ইহাদিগকে অর্দ্ধ-পাখা-যুক্ত বলা হয়।



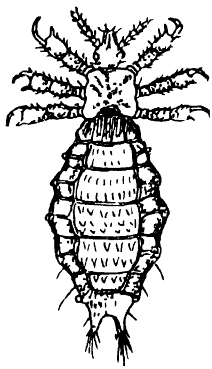
জলচর গোবরে পোকা

ইহাদের সকলেরই গর্ত্ত খনন এবং খাদ্য শোষণ করিবার যন্ত্র আছে। ইহাদের মধ্যে বহু পোকাই গাছের রস খাইয়া জীবন ধারণ করে। কেহ কেহ আবার অত্যন্ত রক্তপিপাসু, এমন কি মানুষকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। তোমাদের নিতান্ত পরিচিত ছারপোকা এবং উকুণই তাহাদের উদাহরণ। এই উপশ্রেণীর কোন কোন কীটের রং খুবই সুন্দর এবং জমকালো। কোন কোন গোবরে পোকা আকারে বেশ বড় হয়। জলচর গোবরে পোকার মধ্যে বেলোষ্টমা (Belostoma Indica) আকারে বেশ বড় এবং অনেকেরই পরিচিত।



ছারপোকা (বর্দ্ধিতাকার)

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ছারপোকা, বিছানাতেই খুব বেশী পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তা ছাড়া রেলগাড়ী ও ট্রামগাড়ীতেও ইহাদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। ইহাদের গন্ধই যে শুধু বিশ্রী তাহা নহে, ইহারা স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিষম অনিষ্টকারী।



উকুণ (বর্দ্ধিতাকার)

প্রাণান্তকর কালাজ্বরের বীজাণু ইহারাই বহন করে। ইহাদের দেহ অতসীকাঁচ দ্বারা পরীক্ষা করিলে শল্কাবৃত দেখা যায়।

উকুণের পাখা নাই বলিয়া ইহাকে এক ভিন্ন উপশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহারা স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্ত পান করিয়াই সাধারণতঃ বাঁচিয়া থাকে। মানুষের মাথায় ও শরীরে যে উকুণ হয়, তাহা বহু রোগের বাহন। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দুর্গন্ধবিশিষ্ট বলিয়া,

সহজেই আত্মরক্ষা করিতে পারে। এই দুর্গন্ধের জন্যই অন্য কোন প্রাণী ইহাদিগকে স্পর্শ করে না। ইহাদের দেহস্থ গণ্ডমালা হইতে একপ্রকার বায়বীয় তৈল বাহির হইয়া অনবরত বাতাসের সহিত মিশিয়া যায় বলিয়াই এরূপ দুর্গন্ধের উৎপত্তি হয়।

বেণেত্রা (Rinatra) আর একটি খুবই সাধারণ জলচর পোকা। আমাদের দেশে ইহা সাধারণতঃ পুকুর, খাল, বিল এবং নদীর জলে প্রায় সব যায়গাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে কতকটা কাদায় ঢাকা



বেণেত্রা

খড়কুটার মত। ইহাদের পা এরূপভাবে গঠিত যে, ইহারা জলের উপর অনায়াসে বেড়াইতে পারে। দরকার হইলে ইহারা জলের তলাতেও চরিয়া বেড়ায়। তোমরা একটু অনুসন্ধান করিলেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে। ইহারাও জলচর গোবরে পোকার ন্যায় বহু ছোট ছোট পোকা ধরিয়া খাইয়া থাকে। সম্মুখের পা দুইটিই ইহারা জীবন্ত পোকা ধরিবার জন্য ব্যবহার করে, মাঝের এবং পিছনের পা চারিটির সাহায্যে জলের উপর এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে যে, তাহাদের দেহ জলস্পর্শ করে না। চলিবার সময় মাঝের পা জোড়াই বেশী কাজ করে, পিছনের পা দুটি শুধু চলিবার গতিনির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাদের পায়ের চাপে জলের উপর সামান্য গর্ত্ত হয় বটে, কিন্তু জলের ভিতর পা ঢুকিয়া যায় না। লাফ্ দিয়া কিংবা পিছল খাইয়া ইহারা জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। চলিবার পক্ষে বায়ুও কখন কখন ইহাদের সাহায্য করে। এ সকল বিষয় তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিও।

দ্বিপাখ পোকা (Diptera)

ইহাদের সম্মুখের দুইটি পাখা বেশ বড় হয়, অন্য দুইটি পাখা রূপান্তরিত হইয়া ইহাদের উড়িবার এবং বসিবার সাহায্যকারী অঙ্গরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মানুষের পরম শত্রু। ইহারাই নানা রকম রোগের প্রধান বাহন। মশা, পিশু (flees) প্রভৃতি পোকা ইহাদের উদাহরণ। ইদুরের দেহে একপ্রকার পিশু হয়, তাহারা প্লেগ নামক ভীষণ মারাত্মক রোগের বীজ বহন করিয়া থাকে। মশার মত পিশুর পাখা নাই বটে, কিন্তু ইহারা লম্ফ দিতে বেশ দক্ষ। ইহাদের দেহের দুইধার ক্রমশঃ সরু হইয়া গঠিত হয়। দেহের এইরূপ গঠনের জন্য তাহারা সহজেই যে কোন প্রাণীদেহের রোমের ভিতর দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। ইহারা ষট্‌পদী পোকার উপশ্রেণী এই দ্বিপাখ পোকাব উদাহরণ, অথচ মোটেই ইহাদের পাখা নাই। কেন যে ইহাদিগকে দুইটি-পাখা বিশিষ্ট পোকার সঙ্গে স্থান দেওয়া হইল, তাহার কথা হয়ত তোমরা প্রশ্ন করিতে পার। যদিও ইহাদের পাখা নাই তথাপি ইহাদের অন্যান্য আকারগত লক্ষণগুলি এই উপশ্রেণীর সঙ্গে মিলিয়া যায় বলিয়াই পাখাহীন পিশুকেও মশাব জ্ঞাতিভাই বলিয়াই ধবিয়া লইতে বৈজ্ঞানিকেরা দ্বিধা বোধ করেন নাই।

মশক বা মশা

মশা তোমাদের সকলেরই পরিচিত। ইহাদের দংশন, রক্তপান কিংবা গান কোনটি তোমাদের প্রিয় নহে। তবুও এই তিনটি গুণের জন্যই তাহারা তোমাদের এতটা পরিচিত। এই মশাদিগের মধ্যে কোন কোন জাতীয় মশা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও পীতজ্বরের বাহন স্বরূপ। এই সকল মশার দংশনের সঙ্গে সঙ্গে, জ্বরের বীজ দেহেব মধ্যে প্রবেশ করিয়া, লোকের জীবন নাশ করিয়া থাকে। সৌভাগ্যক্রমে পীতজ্বর আজও আমাদের দেশে আসিয়া পৌঁছায় নাই। অন্য দুইটি জ্বরের নাম তোমাদের কাহারই অজানা নয়।

মশার শরীর অন্যান্য কীটের ন্যায় তিনটি অংশে বিভক্ত। ইহাদের দংশন ও রক্ত শোষণ করিবার অস্ত্র মুখেই থাকে। গোলাকার মাথার দুইধারে চোখের কাছে দুইটি শুঁড় দেখিতে পাইবে। ইহা-দের সাহায্যে রক্ত শোষণ জন্য ইহারা হুল বসাইবার যায়গা ঠিক করিয়া নেয়। মশার বুকের দুইধারে তিনটি তিনটি করিয়া ছয়খানা পা ও একখানা একখানা করিয়া দুইখানা ডানা আছে। উদর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত এবং তাহার শেষ অংশে ডিমের জন্ম হয়। মাদী মশা জীবজন্তু ও মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। মর্দ্দা মশা, আপনাদের খাদ্য গাছের নানা অংশ ও আবর্জ্জনা হইতে শোষণ করিয়া লয়।



(উপরে) স্ত্রীমশা পুরুষমশা
(মধ্যে) গুচ্ছবদ্ধ ডিম ও গুটি
(নীচে) কীটডিম্ব

মশা যদিও ডাঙ্গায় থাকে তথাপি ডিম পাড়িবার সময় মাদী মশা জলের ধারে হাজির হয় এবং জলের ধারে সাধারণতঃ যে সকল ঘাস জন্মে, তাহার পাতায় বসিয়া সেই পাতারই তলাতে করলা-ফড়িংএর মত জলের উপর খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে। ডিমগুলি গুচ্ছবদ্ধ হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে। সময়ে ডিমগুলির নীচের দিক ফাটিয়া যায় এবং তাহা হইতে কীটডিম্বগুলি বাহির হইয়া আসে। মশার ডিম খুবই ছোট বলিয়া তোমাদের পক্ষে তাহা দেখা কঠিন, কিন্তু ইহাদের কীটডিম্ব, বদ্ধজলে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে। ইহারা দলে দলে জলের উপর ভাসিতে

থাকে এবং অনবরত নড়াচড়া করে। কীটডিম্বের লেজের কাছেই একটি লম্বা নল থাকে এবং ইহারই অগ্রভাগে পাঁচটি আঁইসের মত অংশ, একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে সংলগ্ন দেখিতে পাইবে। মশার কীটডিম্ব ইহাদিগকে বিস্তৃত করিয়া, তাহারই সাহায্যে, জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। ইহারা যখন জলের ভিতর থাকে, তখন পূর্ব্বোক্ত নলের সাহায্যেই শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চালাইয়া থাকে। লেজের কাছে ইহাদের এই নল বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। এই সময়ে ইহাদের মাথার নীচের দিকে, তুলির মত দুইটি অংশ অনবরত নড়িতে থাকে। এরূপ ভাবে জল নাড়াচাড়া করাতে যে স্রোতের সৃষ্টি হয়, তাহাতে অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সহজেই স্রোতের টানে ইহাদের মুখের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে।

কীটডিম্বগুলি ইহার পর গুটির ভিতরে অনাহারে ঘুমাইয়া থাকে। তখন কিন্তু ইহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হয় না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইহারা আকারে বেশ বড় হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের খোলসটি পিছন দিকে ফাটিয়া যায় এবং পূর্ণাঙ্গ একটি মশা বাহির হইয়া আসে। এই নবজাত শিশুমশাগুলির পা এবং পাখা উভয়ই যখন বেশ সবল হয় তখন উড়িয়া যায়।

ইহা হইতে তোমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, জল ছাড়া মশার বংশ বৃদ্ধি হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নাই। আবর্জ্জনাময় অপরিষ্কার বদ্ধজলই বিশেষভাবে ইহাদের জন্মস্থান। যে জল পরিষ্কার এবং সূর্য্যালোকে আলোকিত থাকে, তাহাতে মশার বৃদ্ধি হইতে পারে না। আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে গাছপালায় ঘেরা এঁধো পুকুর, নালা ও ডোবার জলে প্রচুর মশা জন্মিতে পারে। এইগুলি যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাধ্যমত ভরাট করিয়া ফেলিতে পার, তবে মশা ও ম্যালেরিয়া উভয়ের হাত হইতেই রক্ষা পাইবে।

সকল মশাই যে ম্যালেরিয়া বিস্তার করে তাহা কিন্তু ঠিক নয়। যে সকল মশা ম্যালেরিয়ার জন্মদাতা, তাহারা রক্ত শোষণ করিবার সময়, তাহাদের অস্ত্র অন্যান্য মশার মত সোজা ভাবে না বসাইয়া হেলান ভাবে

বসাইয়া থাকে। ইহা তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিও, তাহা হইলেই ম্যালেরিয়ার বাহন এনোফেলিস্ মশাকে সহজেই চিনিতে পারিবে।

শল্কাবৃত পাখাযুক্ত পোকা (Lepidoptera)

ইহাদের দুইজোড়া পাখাই বেশ বড় হয় এবং পাখার উপর বহু শল্ক সাজান থাকে। ইহারা প্রায় সকলেই দেখিতে বেশ জমকালো হয়। রং-বেরংএর যত প্রজাপতি এবং মথ ইহারই উদাহরণ।

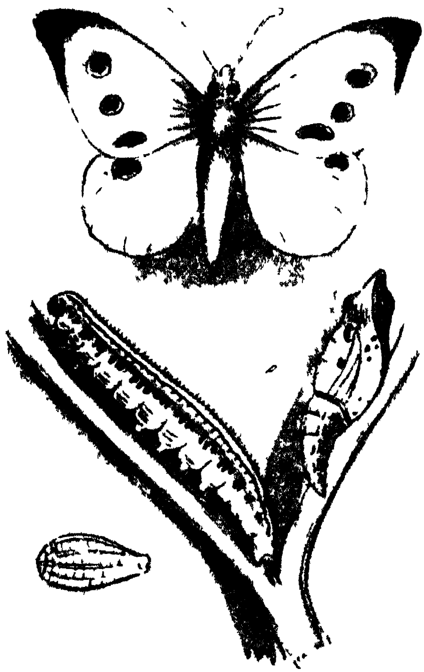
প্রজাপতি

তোমরা যখন বাগানে ফুল তুলিতে যাও, প্রজাপতি দেখ নাই অথবা ধরিবার জন্য তাহার পিছনে কখনও ছুটাছুটি কর নাই—এ কথা কেহই বলিতে পারিবে না। তোমরা যেমন ফুল তুলিয়া থাক, তেমনি আবার প্রজাপতি ধরিবার জন্যও চেষ্টা কর। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিও যে, গাছ হইতে ফুল তুলিলেই যেমন ফুলের সৌন্দর্য্য হানি হইয়া যায়, প্রজাপতিকে বন্দী করিলেই, তেমনি তাহার জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া যায় এবং শীঘ্রই ইহা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক পাখীতেও ইহাদিগকে খাইবার জন্য পিছন পিছন তাড়া করে। অবশ্য ইহাদের আত্মরক্ষারও যে উপায় নাই এমন নহে। ইহাদের পাখার নীচের দিকের রং কতকটা মরা শুক্‌না পাতার মত। শত্রু তাড়া করিলে পাখাগুলি উপরদিকে তুলিয়া ইহারা মরা পাতার উপর চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে। তখন পাখীতে আর খোঁজ পায় না।

এই যে প্রজাপতি দেখিয়া তোমরা এত আনন্দ পাও, ইহারা কিন্তু সব সময়েই এরূপ মনোরম থাকে না। প্রজাপতিকে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে, আরও তিন আকারে তোমরা দেখিয়া থাক। অবশ্য তাহার সে সব আকৃতির কোনটিই তোমরা পছন্দ কর না, বরং ঘৃণাই করিয়া থাক। হয়ত সেরূপ কদর্য্য আকৃতি হইতে কি করিয়া যে এমন

সুন্দর প্রজাপতির জন্ম হইতে পারে, তাহা তোমরা ধারণাই করিতে পারিবে না। ইহার এই আশ্চর্য্য জীবনের কথা সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, তোমরা তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিও।

প্রজাপতি কীট জাতীয় প্রাণী হইলেও ইহাদের মনোরম দুই জোড়া অর্থাৎ চারিখানা পাখার জন্য, ইহাদিগকে কীটেরই অন্তর্গত লেপিডোপ্‌টেরা নামক আর একটি ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের পায়ের সংখ্যা এবং দেহের গঠন মূলতঃ পিপীলিকা এবং মৌমাছিরই মত। ইহাদের উদরের শেষভাগেই ডিমের সৃষ্টি হয়। ইহারা ফুলের মধু খাইয়া



(উপরে) প্রজাপতি
(মধ্যে) শুঁয়াপোকা গুটি
(নীচে—বামদিকে) ডিম



(উপরে) টিপোকা (মথ)
(মধ্যে) ডিম শুয়াপোকা
(নীচে) গুটি ও দ্বিখণ্ডিত গুটি

জীবনধারণ করে বলিয়া ইহাদের মুখে মধু শোষণ করিয়া খাইবাব যন্ত্র আছে। ইহা আবার সকল প্রজাপতিতে একরূপ নয়। কোন কোন প্রজাপতির মুখে স্প্রিং-এর মত গুটান শুঁড় থাকে। আব এক শ্রেণীর প্রজাপতি আছে, তাহাদের শুঁড় খুব খাট। এই জন্য প্রজাপতিকেও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। শেষোক্ত জাতীয় প্রজাপতিব নাম 'মথ'। ইহারা সাধারণতঃ রাত্রিবেলা খাবারের অনুসন্ধানে বাহির হয়। লম্বা শুঁড়ওয়ালা প্রজাপতিরা দিনেব বেলায়ই ফুলে ফুলে উড়িয়া মধু খাইয়া থাকে।

তোমরা যে রেশমের জামা ব্যবহার কর, সেই রেশম প্রজাপতির বাচ্চাতেই প্রস্তুত করিয়া থাকে। মথ-জাতীয় প্রজাপতির বাচ্চা যে গুটি প্রস্তুত করে, তাহা হইতেই রেশম হয়। আমাদের দেশে কোন কোন যায়গায় —বিশেষতঃ আসাম প্রদেশে—এইরূপ গুটি উৎপাদন করা হইয়া থাকে।

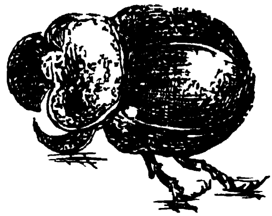
কচি পাতার তলাতেই সাধারণতঃ প্রজাপতি ডিম পাড়িয়া রাখে। বিভিন্ন রকম প্রজাপতির ডিমের আকার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইলেও ইহাদের গঠন এবং রং একই রকমের হইয়া থাকে। এই ডিমগুলি পুষ্ট হইলে ফাটিয়া তাহা হইতে শুঁয়াপোকা বাহির হইয়া আসে। ডিমগুলি পুষ্ট হইতে সাধারণতঃ আট দশ দিন সময় লাগে। শুঁয়াপোকার ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল। ইহাবা ডিম হইতে বাহির হইয়াই, যে পাতাতে তাহাদের জন্ম হয়, প্রথমতঃ তাহাই খাইতে আরম্ভ করে, অথবা যে ডিম হইতে বাহির হইয়া আসে তাহার খোলসই খাইতে থাকে। তারপর ইহারা ক্রমশঃ আকারে বড় হয় এবং বার বার খোলস ত্যাগ করিতে থাকে। শুঁয়াপোকা তোমরা অনেক দেখিয়াছ, ইহাদের দেহ লম্বা এবং খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত। আমাদের দেশে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সম্মুখের দিকে ছয়টি পা বেশ পুষ্ট, পিছন দিকের চারিটি পা তেমন পুষ্ট নহে, আকারেও ছোট। ইহারা গাছপালার ভীষণ শত্রু। পশু-পক্ষীতে খাইয়া যদি ইহাদের সংখ্যা খুব কমাইয়া না ফেলিত, তবে পৃথিবীতে হয়ত আজ পর্য্যন্ত কোন গাছপালাই থাকিত না।

বার বার খোলস ত্যাগের পর সূতার আবরণে আবৃত হইয়া শুঁয়া-পোকাগুলি মরার মত পড়িয়া থাকে। এই সময়ের এই আবরণকেই গুটি বলে। গুটি প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ ইহারা ছয় বার খোলস ত্যাগ করে। গুটির ভিতরে ইহাদের অসম্ভব রকম পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। গুটি হইতে সুন্দর মনোরম একটি প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে। গুটি হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর তাহারা কিছুকাল দাঁড়াইযা পাখাগুলি অনবরত নাড়িতে থাকে। ইহাতে তাহাদের শরীর শুকাইয়া অনেকটা হাল্কা হইয়া যায়, পা ও পাখাগুলি ক্রমশঃ সবল হয়। তারপর তাহারা উড়িয়া যায়। প্রজাপতির মুখ খুব ছোট, এজন্য তাহারা বেশী কিছু খাইতে পারে না। দুই তিন দিন ফুলে ফুলে উড়িয়া মধু খায় এবং সুবিধা মত যায়গায় ডিম পাড়ে। এরপর মরিয়া যায়।

দৃঢ়াবরণ-পাখাধারী পোকা (Coleoptera)

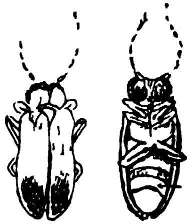
এই উপশ্রেণীর অন্তর্গত পোকার দেহের উপরিভাগ একজোড়া কঠিন পাখা দ্বারা আবৃত থাকে। তাহাদ্বারা ইহাদের নীচে যে দুইটি উড়িবার পাখা থাকে তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর সকল পোকাকেই গোবরে পোকা বলিয়া থাকে। যদিও সকল প্রকার গোবরে পোকাই ষট্‌পদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তথাপি ইহাদিগকে তুলনা করিলেই দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের মধ্যে আকারগত বেশ পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যের জন্যই আবার ইহাদিগের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। এই উপশ্রেণীর গোবরে পোকারা বুকের প্রথম খণ্ড ইচ্ছামত ইতস্ততঃ নাড়াচাড়া করিতে পারে। তাহারা তাহাদের সুগঠিত চুয়ালদ্বারা দংশন এবং চর্ব্বণ এই উভয় কার্য্যই করিয়া থাকে।

এই উপশ্রেণীব গোববে পোকা আমাদেব দেশে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায। ইহাদেব কঠিন পাখা দুইটিব জন্য ইহাদিগকে চিনিযা লইতে তোমাদেব বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। ইহাদেব মধ্যে মনোবম বর্ণবিশিষ্ট পোকাব সংখ্যাই বেশী। কেহ কেহ আবাব আকাবেও মস্তবড হইযা থাকে। এই উপশ্রেণীব একটি বড কাল গোববে পোকাব ছবি এখানে দেওযা হইল। ইহাকে হযত তোমবা অনেকেই দেখিযাছ। বাত্রিবেলা ঘবে যখন আলো জ্বালান থাকে তখন ইহাবা মাঝে মাঝে ঘবেব ভিতবও ঢুকিযা আলোব চাবিদিকে উডিতে থাকে। ইহাদেব মধ্যে কেহ কেহ তাল ও নারিকেল জাতীয গাছেব ভীষণ শত্রু। অন্য কতকগুলি আবাব ফসলেব অনিষ্টকাবী বহু পোকা খাইযা ফেলিযা ফসলেব খুব উপকাব কবে।



কাল গোববে পোকা

তোমাদেব সকলেবই পবিচিত খদ্যোৎ বা জোনাকী পোকাও এই উপশ্রেণীবই অন্তর্গত। বাত্রিকালে ঘন বন-জঙ্গলেব ধাবে ইহাবা যখন দলে দলে উডিতে থাকে তখন ইহাদেব উদবেব নীচেব দিক হইতে অনববত আলোক বিকিবণ হইতে থাকে। এই আলোকেব জন্যই তাহাবা তোমাদেব এতটা পবিচিত। সূর্য্যেব আলো, প্রদীপেব আলো, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি সকল বকম আলোতেই তোমবা গবম বোধ কব, কিন্তু জোনাকী পোকাব আলোব মজা এই যে, আলো জ্বলিতেছে, হাত দাও, গরম বোধ হইবে না। ইহাবা কোথা হইতে এই আলো পায়, তাহা বোধ হয় তোমরা কেহই জান না। ইহাদেব উদবেব নীচেব দিকে তৈলপূর্ণ কতকগুলি কোষ আছে। সেই সকল কোষেব ভিতর আবাব আলোক উৎপাদন জন্য বহু নলেব দ্বাবা অম্লজান বাষ্প (Oxygen) সরববাহ হয। ইহাতে এরূপ সহজ জ্বলনশীল পদার্থেব (Phosphorescence)



আলোক বিকিবণেব স্থান

সাধাবণ জোনাকী পোকা
(বর্দ্ধিতাকাব)

উৎপন্ন হয় যে, তাহা আপনা হইতে জ্বলিতে থাকে। যদিও এই আলোক একটি সামান্য পোকার আলোক মাত্র, তথাপি ইহার ক্ষমতা অনেক সাধারণ আলোকের চাইতে বেশী। রঞ্জনালোকের কথা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। ইহা যেমন অস্বচ্ছ কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়াও আলোক বিকিরণ করে, তেমনি জোনাকী পোকার আলোকও অস্বচ্ছ কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসে। মানুষের অসীম ক্ষমতা, এবং তাঁহারা নানা রকম আলোক উৎপাদন করিয়াছেন একথাও সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই আজ পর্য্যন্ত জোনাকী পোকার মত এরূপ উত্তাপহীন আলোক উৎপাদন করিতে পারেন নাই। ক্ষুদ্র একটি জোনাকী পোকার আলোকে তোমরা ইচ্ছা করিলে আঁধারে ঘড়ী দেখিয়া সময় ঠিক করিতে পার। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেছ যে, জোনাকী পোকার দেহের তুলনায় তাহাদের আলো নিতান্ত কম নহে।

জোনাকী পোকার আলোক দেখিয়া তোমরা আনন্দলাভ কর বটে, কিন্তু জোনাকী পোকার ইহাতে যে কি লাভ হয়, সেটা অবশ্য ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তাহাদেরও নিশ্চয়ই এই আলোকের একটা আবশ্যকতা আছে। তাহাই এখন বলিতেছি। মর্দ্দা জোনাকী পোকার পাখা আছে, তাহারা উড়িতে পারে। তাহাদের আলো একটু থামিয়া থামিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। মাদী পোকার পাখা নাই, সে তাহার যায়গায় বসিয়াই আলোক বিকিরণ করে। এই আলো দেখিয়া মর্দ্দা জোনাকী পোকা দলে দলে মাদী জোনাকী পোকার কাছে আসিয়া হাজির হয়। এই আলোকই তাহাদের মিলনের সুবিধা করিয়া দেয়।

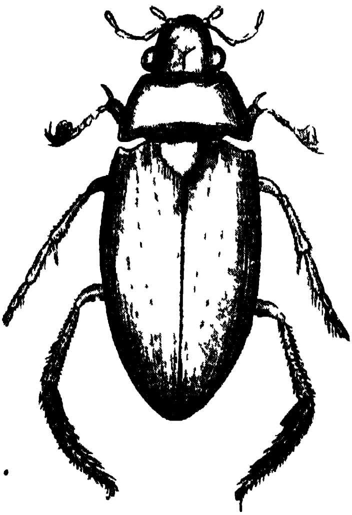
দিনের বেলা জোনাকী পোকার আকার সাধারণ গোবরে পোকারই মত, বিশেষ কোন তফাৎ নাই। মাত্র রাত্রিবেলায়ই তাহারা আলো দিয়া থাকে। রাত্রিবেলা পথিকগণকেও ইহারা কোন কোন স্থানে আলোদ্বারা পথ চলিবার সাহায্য করিয়া থাকে। দাক্ষিণ আমেরিকায় রাত্রিকালে পথিকগণ, বনের ভিতর দিয়া চলিবার সময় কখনও কখনও পায়ে জুতার সহিত

জোনাকী পোকা বাঁধিয়া রাখে। সেই জোনাকী পোকার আলোকে তাহারা পথ দেখিয়া থাকে। এই জোনাকী পোকাই আবার বহুরকমের কিন্তু তাহারা সকলেই গোবরে পোকার জ্ঞাতি ভাই।

স্থলচর গোবরে পোকা তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। জলে ও নানা রকমের গোবরে পোকা দেখিতে পাইবে, তাহাদের মধ্যে পর পৃষ্ঠায় যে গোবরে পোকার ছবি দেখিতেছ, তাহা প্রায় সকল পুকুরেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পোকার পিঠের দিকের আবরণ স্বরূপ যে দুইটি পাখা থাকে তাহারা বেশ দৃঢ়। ইহাদের নীচেই উড়িবার সুবিধার জন্য আর দুইটি পাতলা পাখা আছে, তাহা তাহারা উড়িবার সময় বাহির করে। অন্য সময় ইহারা পূর্ব্বোক্ত কঠিন পাখা দুইটির নীচে লুকান থাকে, সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা ইহাদের দেহের সম্মুখভাগ অর্থাৎ মাথা ও তৎসংলগ্ন অংশ, বেশ নাড়াচাড়া করিতে পারে। ইহাদের চোয়াল রীতিমত দৃঢ়। এই চোয়ালের সাহায্যে ইহারা ইহাদের খাদ্য কামড়াইয়া ধরে এবং চর্ব্বণ করিয়া থাকে। ইহাদের পায়ের সংখ্যা ছয়টি, প্রত্যেকটিই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। পশ্চাৎ দিকের পা দুটির শেষ খণ্ডে, লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, তাহা চিরুণীর মত বহু রোমসংযুক্ত আছে। অন্য পায়েতেও যে এরূপ রোম নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহারা এত বড় ও ঘন হয় না। ইহারই সাহায্যে তাহারা জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া থাকে। স্থলচর গোবরে পোকার পা এইপ্রকার রোম সংযুক্ত থাকে না। বুঝিতেই পারিতেছ যে, ইহারা সর্ব্বদা ডাঙ্গায় বাস করে বলিয়া ইহাদের এরূপ কোন অঙ্গের আবশ্যকও নাই। গোবরে পোকার দেহের আকার সাধারণতঃ কতকটা বাদামের মত। ইহাদের দেহ, পিঠের উপরদিকে, দুই দিক হইতে ক্রমশঃ উচু হইয়া উঠে এবং উদর ও বক্ষের নীচের দিক সমান থাকে। পশ্চাৎ ভাগে উদর ক্রমশঃ সরু হইয়া খাট লেজের আকার ধারণ করে। জলচর গোবরে পোকা জলে ডুবিয়া যাইবার সময়, এই লেজ ও তাহার উপরকার কঠিন আবরণের মধ্যে, জলের উপর হইতে বায়ু সংগ্রহ করিয়া নিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে সকলগুলি সমান বড় না

হইলেও কোন কোন জলচর গোবরে পোকা বেশ বড় হয়। তোমাদের পক্ষে বড়গুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখা সুবিধাজনক।

কোন কোন বড় জাতীয় জলচর গোবরে পোকা, জলের তলাতে ঘাসের পাতা কিংবা এরূপ অন্য কিছু জিনিষ ধরিয়া বসিয়া থাকে। জলের উপরে আসিবার সময় তাহারা তাহাদের এই আশ্রয় ছাড়িয়া দেয় এবং অতি সহজেই জলের উপর ভাসিয়া উঠে। ইহারা জলের উপর হইতে হঠাৎ উড়িতে পারে না। প্রথমতঃ ঘাসের পাতা কিংবা এইরূপ অন্য কোন আশ্রয়ের সাহায্যে অল্পে অল্পে জল হইতে উঠিয়া থাকে, তারপর সেখান হইতে উড়িয়া যায়।



জলচর গোবরে পোকা

কোন কোন জলচর গোবরে পোকার গায়ে হাত দিলে তাহাদের দেহের গ্রন্থি হইতে দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বাহির হইয়া হাতে লাগিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে, তাহাদের দেহের উপরকার কঠিন পাখা দুইটির অগ্রভাগ, দেহের সঙ্গে ঘর্ষণ করিয়া, এক প্রকার শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ জল হইতে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাহারা এরূপ শব্দের উৎপাদন করে। ডিম পাড়িবার সময়, মাদী গোবরে পোকা জলের তলে ঘাসের পাতার উপর গর্ত্ত করে। তাহাতে তাহার লম্বাপানা ডিমগুলি, একটির পর একটি পরস্পর সংলগ্ন ভাবে সাজাইয়া রাখে। কোন কোন গোবরে পোকা, ও তাহাদের ডিম হইতে উৎপন্ন কীটকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা ধরিয়াও খাইতে দেখা যায়।

সূক্ষ্ম স্বচ্ছ পাখাধারী পোকা (Hymenoptera)

এই উপশ্রেণীর বহু পোকাই তোমাদেব পরিচিত। ইহাদেব চারিটি পাখা সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ। নানা রকম মাছি, মৌমাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল, কাঁচপোকা ও নানারকম পিপীলিকা এই উপশ্রেণীরই অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি প্রাণীব পাখা তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে। ইহাদেব মধ্যে কোন কোন পোকার মুখ এরূপ ভাবেই গঠিত যে, তাহাবা ইহাদ্বারা দংশন এবং লেহন উভয় কার্য্যই করিতে পাবে। তোমবা এই সকল পোকার দেহের গঠন লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহাদের বক্ষেব প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ পরস্পব সংযুক্ত। এই উপশ্রেণীর পোকার ইহাই একটি বিশেষত্ব। ইহাদের মধ্যে মৌমাছি, বোল্‌তা, ভীমরুল ও পিপীলিকার বুদ্ধিবৃত্তিব সবিশেষ পবিচয় পাওয়া যায়। এস্থলে মৌমাছি ও পিপীলিকাব আকার ও কার্য্যপ্রণালীব আলোচনা করা হইল। এই দুইটি পোকা তোমাদের সকলেরই পরিচিত; সুতবাং ইহাদেব সম্বন্ধে যে সকল কথা এখানে বলা হইবে, তাহা তোমরা সহজেই অনুসন্ধান কবিয়া দেখিতে পার। এই উপশ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রাণীর বিষয়ও তোমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিও।

পিপীলিকা

পোকা জাতীয় প্রাণীব বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই তোমাদের পিপীলিকা বা পিঁপড়ার কথা মনে পড়িবে। ছাট-বড় লাল-কাল প্রভৃতি নানা রকমের পিপীলিকাই তোমরা দেখিতে পাও। ইহারাও তোমাদের মত মিষ্টি খাইতে ভালবাসে। পিপীলিকার নজর হইতে মিষ্টি জিনিষ লুকাইয়া রাখা বড় কঠিন। মিষ্টি জিনিষ বাক্‌সের ভিতর তালা দিয়া বাখিলে তোমরা হয়ত খোঁজ পাইবে না, কিন্তু সামান্য একটু ফাঁক

থাকিলেই তাহারা দলে দলে বাক্সের ভিতর ঢুকিয়া তাহা চুরি করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের গায়ের জোরও শরীরের অনুপাতে অনেক বেশী। পিপীলিকার চলা-ফেরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, মস্তবড় কোন পোকার মৃতদেহ, অথবা মিশ্রির টুকরা, মাত্র কয়েকটি পিপীলিকাতেই অবলীলাক্রমে বহন করিয়া নিয়া যাইতেছে।

ইহাদের দেহের গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করিবার জন্য বেশ বড় জাতীয় কাল কিংবা লাল পিপীলিকার দেহই, অতসী কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করা তোমাদের পক্ষে সুবিধাজনক। পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবে যে, ইহাদের দেহ—মাথা, বক ও উদর এই তিন ভাগে বিভক্ত। মাথার আকার



পিপীলিকার বাসা

কতকটা গোলাকার, কিন্তু সামনে ও পিছনদিকে কিঞ্চিৎ চাপা। মাথার দুইধারে ধারাল শাঁড়াসীর মত দুইটি দাঁড়া আছে। ইহারই সাহায্যে তাহারা কোন কিছু জিনিষ টানিয়া নিতে পারে। ইহাই আবার তাহাদের কামড়াইবার অস্ত্র। লক্ষ্য করিয়া দেখিও ইহারা কামড় দিয়াও একটু তরল বিষাক্ত পদার্থ

ক্ষতস্থানে ঢালিয়া দেয়, তাতে বেশ জ্বালা করে। মাথার ঠিক সম্মুখেই দুইটি খুব ছোট ছোট চক্ষু থাকে। লক্ষ্য করিলে খালি চোখেও তাহা দেখিতে পাইবে। বুকের অংশ অপেক্ষাকৃত সরু। ইহারই দুই ধারে তিনখানা করিয়া ছয়খানা পা থাকে। এছাড়া পুরুষ ও রাণী পিপীলিকার বুকের দুইদিকে দুইখানা দুইখানা করিয়া চারিখানা ডানাও দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা হয়ত বলিতে পার যে, যে সকল সাধারণ পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে এরূপ ডানা ত বড় একটা দেখা যায় না। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, প্রত্যেক পিপীলিকার দলেই তিন রকম পিপীলিকা থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই রকম, অর্থাৎ পুরুষ ও রাণী পিপীলিকার কথা ত উল্লেখই করা হইয়াছে। তা'ছাড়াও, দলে অন্য আর এক রকমের পিপীলিকা থাকে, তাহাদিগকে কর্ম্মী পিপীলিকা বলে। ইহাদের পাখা থাকে না। দলে ইহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই তিন প্রকার পিপীলিকারই উদরের নীচের অংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে।

ইহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া মাটির ভিতরে গর্ত্ত কবিয়া অথবা গাছের পাতা দ্বারা ঘর তৈয়ার করিয়া বাস করে। বড় লাল পিপীলিকা আমাদের দেশে অনেক গাছেই বাসা বাঁধিয়া থাকে, তবে আমগাছেই বেশী বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বাসা তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। গাছের কতকগুলি পাতা, ইহারা সাদা কাগজের মত আবরণ দ্বারা পরস্পর জড়াইয়া, বাসা প্রস্তুত করে। আমাদের বাড়ীতে যেমন ভাড়ার ঘব, শয়ন ঘর ও সূতিকাঘর প্রভৃতি নানা রকম ঘর থাকে, পিপীলিকার বাসাতেও সেইরূপ নানা রকম কাজের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঘর থাকে। বাসা হইতে বাহির হইবার জন্য কতকগুলি দরজাও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের বাসা যেন তাহাদের এক একটি রাজ্য। মাটিতে যে সকল পিপীলিকা বাসা প্রস্তুত করে, তাহাদের বাসাতেও এইরূপ নানা কাজের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঘর থাকে।

প্রত্যেক দলে যে তিন শ্রেণীর পিপীলিকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে,

তাহাদের পরস্পরের আকার এব‚ গঠনের যেমন একটু তফাৎ আছে, তেমনি তাহাদের কার্য্যপ্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। মাদী পিপীলিকা দলের সকলের মা, তাহার আকারও অন্যান্য পিপীলিকার চাইতে অনেক বড়। সেই জন্য তাহাকে দলের রাণী বলা হইয়া থাকে। ইহার কাজ ডিম পাড়িয়া দলে পিপীলিকাব সংখ্যা বৃদ্ধি করা। পুরুষ পিপীলিকাগুলি আকারে ইহাদের চাইতে কিছু ছোট এবং অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। তাহারা প্রায় কোন কাজই করে না। কর্ম্মী পিপীলিকাগুলি আকাবে সকলের চাইতে ছোট হইলেও অত্যন্ত পরিশ্রমী। দলেব যত কিছু কাজ সকলই ইহারা করিয়া থাকে। দলের জন্য ঘর তৈয়ার করা, খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনা, বাসা পাহারা দেওয়া, এমন কি ছোট ছোট বাচ্চাদিগকে খাওয়ান ইত্যাদি কাজের কখনও বিরাম নাই। ইহারা নানা কাজে বাহিরে চারিদিকে ছুটাছুটি করে বলিয়া সাধারণতঃ ইহাদিগের সহিত তোমাদেব সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। অন্য দুই জাতীয় পিপীলিকা দেখিতে হইলে বাসাব ভিতবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। পিপীলিকার বাসা বাহির করিতে তোমাদেব বেগ পাওয়াব বিশেষ কোন কারণ নাই। কর্ম্মী পিপীলিকাগুলিব গতিবিধি লক্ষ্য কবিলেই তাহাদের বাসার খোঁজ পাইবে।

পিপীলিকা যত বড়ই হউক না কেন, তাহাদের ডিম কিন্তু খুব ছোট ছোট। সাধারণতঃ যাহাকে তোমরা ডিম বলিয়া মনে কর, তাহা ডিম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু আকারে ডিমেব চাইতে অনেক বড় হয়। ইহাদের খাদ্য খাইবার মুখ আছে এবং একটু নড়িতেও পারে। কর্ম্মী পিপীলিকা ইহাদিগকে খাবার দিয়া বাঁচাইয়া রাখে। ডিম বড় হইয়া যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে কীটডিম্ব বলে। কীটডিম্বগুলি ক্রমে ক্রমে পাতলা আবরণে আবৃত হইয়া গুটির আকার ধারণ করে। গুটির ভিতরেই পিপীলিকার সকল অঙ্গ গঠিত হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ পিপীলিকা উৎপন্ন হয়। তারপব যখন বেশ সবল হয়, তখন সে আবরণ কাটিয়া

বাহির হইয়া পড়ে। পিপীলিকার যে কোন বাসাতেই ডিমের এই তিন অবস্থা দেখিতে পাইবে।

পিপীলিকার কাজকর্ম্ম আচার-ব্যবহার আলোচনা করিলে প্রথমতঃ তোমাদিগের নিকট গল্পের মত বোধ হইতে পারে, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সকলই সত্য বলিয়া বোধ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর আনন্দও লাভ করিবে।

মৌমাছি

মৌমাছি যে শুধু পিপীলিকার মত কীটজাতীয় প্রাণী তাহা নহে। ইহাদের দেহের গঠন, শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি সকলই পিপীলিকার মত। অবশ্য ইহাদের মধ্যে রাণী, কর্ম্মী কিংবা পুংজাতীয় যে কোন শ্রেণীর মৌমাছিই হউক না কেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই দুইটি দুইটি করিয়া চারিটি পাখা আছে। মাছিদের মধ্যে শুধু মৌমাছিরাই পিপীলিকার মত দল-বদ্ধ হইয়া বাস করে। মৌচাক তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। মৌচাক মৌমাছিদিগের একটি ছোটখাট রাজ্য বিশেষ। স্ত্রী মৌমাছি, সকল মৌমাছির মা এবং মৌচাকের রাণী। রাণীকে দলের সকলেই খুব সম্মান করে। যাহা তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য তাহাই তাহারা রাণীকে খাওয়ায়। তাহারা প্রায় সকলেই মধু ও পরাগ মিশাইয়া, বাচ্চা মৌমাছিদিগের জন্য এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে। ফুলের মধু হইতে মধু প্রস্তুত করিয়া চাকে সঞ্চয় করাও তাহাদের অন্য আর একটি কাজ।

চাকে ঘর ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল অস্ত্রের দরকার তাহা তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই আছে। কর্ম্মী মৌমাছিরা যখন ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইতে থাকে, তখন যদি কোন একটি মৌমাছি ধরিতে পার, তবে নিজেরাই ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার

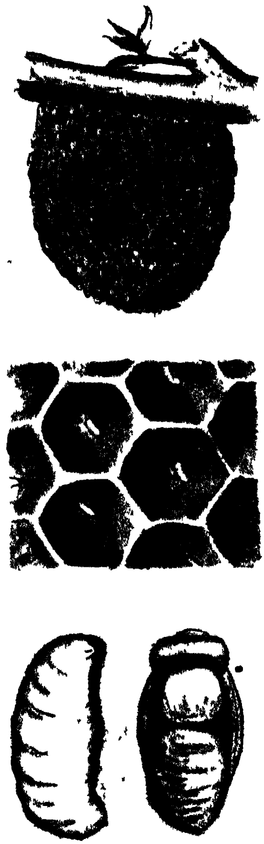
সুযোগ পাইবে। ইহাদের দেহের কতকগুলি অংশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। ইহাদের পায়ে এবং পিঠে যে রোম থাকে, তাহা দ্বারা ইহারা ফুল হইতে পরাগ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাদের পিছন দিকের পা দুইটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিও। এই পা দুইটি খণ্ড খণ্ড এবং পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ। তাহাদের মধ্যে দুইটি খণ্ড বিশেষভাবে প্রশস্ত। এই খণ্ড দুইটির পিছন দিকেই আবার চিরুণীর দাঁতের মত, বেশ শক্ত রোম, দুই সারিতে সাজান আছে। ইহার সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে এই মৌমাছিরা পরাগগুলি আচড়াইয়া, সেই প্রশস্ত খণ্ড দুইটির সংযোগস্থলে যে গর্ত্ত আছে তাহাতে জমা করিতে পারে। কর্ম্মী মৌমাছিরা এইরূপে ফুলে ফুলে পরাগ সংগ্রহ করিয়া চাকের দিকে ফিরিয়া যায়। হইাদের উদরের নীচের দিকে, উদরের খণ্ড খণ্ড অংশগুলি যে রেখায় মিলিত থাকে, সেখানে এক একটি নালার মত দেখিতে পাওয়া যায়। এই নালাগুলির মধ্যেই মোম প্রস্তুত হয়। এই মোম ইহারা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া নেয়, এবং কাজে লাগায়। এই মোম কাটিবার অস্ত্রও পিছনের পায়ের সেই দুইটি বিস্তৃত অংশের সংযোগস্থলেই দেখিতে পাইবে। ইহাদের দুইটি মাথা পরস্পর চাপা দিয়া ইহারা কাঁচির মত মোমের



(১ম) রাণী মৌমাছি (২য়] মৌমাছি
(৩য়) পুরুষ মৌমাছি ৪র্থ) মৌমাছির পিছনের পা

টুক্‌রা কাটিয়া ফেলে। তাহা হইলেই দেখ ইহাদের নিত্য ব্যবহারের অস্ত্র ইহাদের অঙ্গেই কেমন লুকান আছে। এই কর্ম্মী মৌমাছিরা স্ত্রী জাতীয় মৌমাছি হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবশ্য তাহাদের দেহের আকার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই সকল মৌমাছির পিছনে ডিম্ব প্রসবের যে লম্বা নলী থাকে, তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া হুলের আকার ধারণ করে। পিপীলিকার মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক পিপীলিকাই আছে, যাহাদের এরূপ হুল আছে; অবশ্য কাহারও নাই একথা বলা চলে না। আমাদের দেশে এক প্রকার বিষাক্ত কাল পিপীলিকা আছে—যাহাদের হুলের বেদনা কতটুকু হয়ত তোমাদের মধ্যে অনেকেই অবগত আছ।

চাক প্রস্তুত করিবার সময়, দলের কতকগুলি মৌমাছি চাক বাঁধিবার যায়গা সজোরে আক্‌ড়াইয়া ধরে। তারপর অন্যান্য মৌমাছিগুলিও তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া, একে অন্যে পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বেশ একটি জালের মত সৃষ্টি করে, এবং ঝুলিতে থাকে। তারপর মোম দ্বারা বাসার ভিত্তি স্থাপন করিলে, মিস্ত্রি মৌমাছি, ভাল রকম পরীক্ষা করিয়া তাহাতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ষড়্‌ভুজাকৃতি ঘর তৈয়ার করে। ঘরগুলি তৈয়ার হইয়া গেলে পর, রাণী মৌমাছি প্রত্যেক ঘরেই এক একটি অতি ক্ষুদ্র ডিম পাড়িয়া রাখে।



(উপরে) মৌচাক ; (মধ্যে) চাকে মৌমাছির ডিম
(নীচে) কীটডিম্ব ও বাচ্চা মৌমাছি

মৌমাছির ডিমগুলি তিন চারি দিনে কীটডিম্বে পরিণত হয়। যে সকল কর্ম্মী মৌমাছি ইহাদের যত্ন করে, সেই ধাত্রী স্থানীয় মৌমাছিরা, ইহাদিগকে খাওয়াইয়া থাকে। তারপর কীটডিম্ব সূতার গুটি প্রস্তুত করিয়া, ঘরের ভিতর বিশ্রাম করে। কয়েকদিন মধ্যেই ইহাদের দেহে একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তিন সপ্তাহের ভিতরেই বাচ্চা মৌমাছি চাক হইতে বাহির হইয়া যাওয়াব মত বড় হইয়া পড়ে। বিভিন্ন রকম কাজের উপযুক্ত যতটুকু শিক্ষা তাহাদের দরকার, এই সময়ে ধাত্রী মৌমাছির নিকট হইতেই তাহারা তাহা লাভ করিয়া থাকে। মৌচাকে যাহাতে তাপের বৃদ্ধি না হইতে পারে তাহার জন্য শিশু মৌমাছিরা, অনবরত তাহাদের ডানা নাড়িয়া চাকের উপর হাওয়া করিতে থাকে। ইহাই তাহাদের প্রধান কাজ।

কর্ম্মী মৌমাছিদের উৎপত্তি ও গঠনের কথা তোমরা শুনিয়াছ। এখন রাণীও পুংমৌমাছির জন্মকথা বলিয়াই এ কথার শেষ করিব।

রাণী মৌমাছিরা আকারে অন্যান্য মৌমাছিদের চাইতে অনেক বড়। তাহারা দিনের মধ্যে তিন হাজার হইতে, চারি হাজার পর্য্যন্ত ডিম পাড়িতে পারে। রাণী মৌমাছির জন্ম, মৌমাছিদের সাধারণ ডিম হইতেই হইয়া থাকে। যে ডিম হইতে রাণীর সৃষ্টি হইবে, তাহার প্রতি কর্ম্মী মৌমাছিদের সর্ব্বদাই সতর্ক দৃষ্টি থাকে। একটি রাণী মৌমাছি বেশ বড়সড় হইতে পনর-ষোল দিন সময় লাগে। তাহার থাকিবার ঘর, দেখিতে বেশ বড় একটি বাদামের মত। ডিম্ব প্রসব করাই রাণীর একমাত্র কাজ। প্রত্যেক রাণী প্রায় তিন বৎসর জীবিত থাকে। একটি চাকে একটির বেশী রাণী হইলেই ঝগড়া বাঁধিয়া যায়। যাহার শক্তি বেশী সে অন্যটিকে বধ করিয়া ফেলে।

পুংজাতীয় মৌমাছির উৎপত্তি রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহারা অত্যন্ত অলস, এবং রাণীর সাথে ঘোরা-ফেরাই তাহাদের কাজ। কিছুকাল পরে কর্ম্মী মৌমাছিরা তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলে, আর কখনও বা নিজ হইতেই পালাইয়া যায়। চাকে মৌমাছির সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গেলে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পৃথক্ হইয়া, নূতন রাণীর অধীনে আর একটি দলের সৃষ্টি করে।

৫। লূতাদি বর্গ

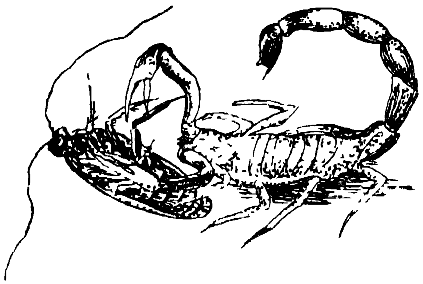
(Arachnida)

মাকড়শার অন্য নাম লূতা। মাকড়শা-জাতীয় অন্যান্য প্রাণী, যেমন বিচ্ছু বা বৃশ্চিক ও আঠালী প্রভৃতি এই লূতাদিবর্গেরই অন্তর্গত। ষট্‌পদী প্রাণী হইতে ইহাদের দেহগঠনে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি প্রাণীর দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কোনটিই তোমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। মাকড়শার ত কথাই নাই, সব সময়ে সকল যায়গাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাথার ও বক্ষের খণ্ডগুলি পবস্পর ঘনসন্নিবিষ্ট থাকাতে এই জাতীয় প্রাণীর দেহে সাধারণতঃ মাত্র দুইটি খণ্ড দেখিতে পাইবে। একটি তাহাদের সম্মিলিত মাথা ও বক্ষের অংশ, অন্যটি তাহাদের উদর। ষট্‌পদী পোকাতে কিন্তু তোমরা দেহের তিনটি অংশ সহজেই পৃথকরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। এ ছাড়া ইহাদের ছয়টিস্থলে আট্‌টি গ্রন্থিযুক্ত পা দেখিতে পাইবে। এই সকল কারণেই ষট্‌পদী প্রাণিবর্গ হইতে ইহাদিগকে লূতাদিবর্গ নামক একটি ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে। পুংস্ত্রী-ভেদে ইহাদের দুই রকম কীট হইতে দেখা যায়। ইহারা বায়ুনলী (tracheae) এবং বায়ুকোষ (lung books)—এই দুইটির দ্বারাই শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করিয়া থাকে। দেখিবার জন্য ইহাদের সহজ-গঠন (simple) কয়েকটি চক্ষু আছে।

বিচ্ছু বা বৃশ্চিক

আমাদের দেশে বৃশ্চিক প্রায় সব যায়গাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কটা-রংএর এক প্রকার বৃশ্চিক আলমারির ভিতর বইয়ের ফাঁকে, ঘরের কোণে অথবা আবর্জ্জনার ভিতরে খুব বেশী জন্মিতে দেখা যায়।

ইহাদের দংশন বিষাক্ত কিন্তু মারাত্মক নহে। এ ছাড়া আরও বহু রকমের বৃশ্চিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শুধু রাত্রিকালেই খাদ্যের অনুসন্ধানে বাহির হয়। তাহারা যে সকল প্রাণী বধ করিতে পারে, তাহাই তাহারা খাইয়া থাকে। আরশুলা ইহাদের বড় প্রিয় খাদ্য। সুবিধা পাইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বধ করিয়া খাইতেও পিছুপা হয় না। তাহারা খোলস ত্যাগ করিয়া থাকে। তাহারা যেখানে বাস করে, তোমরা অনুসন্ধান করিলেই, তথায় এই পরিত্যক্ত খোলস দেখিতে পাইবে।



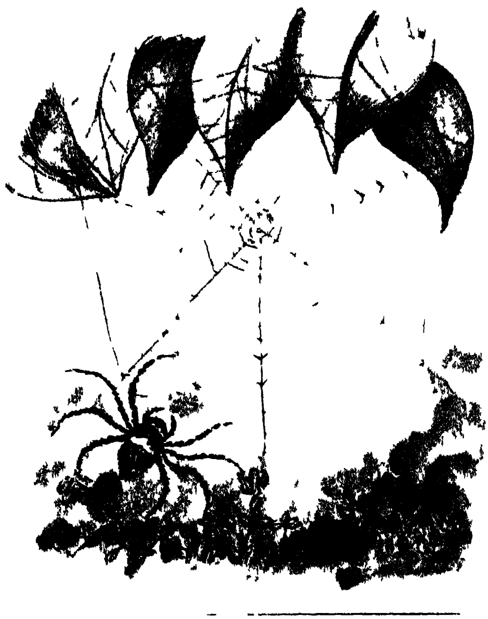
বৃশ্চিকের আরশুলা শিকার

যদিও ইহাদের মস্তক এবং বক্ষঃস্থল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই খণ্ডে পরিণত হইয়া যায়, তবুও ইহাদের দেহ পরিষ্কার তিনভাগে বিভক্ত দেখিতে পাইবে। ইহাদের দেহ তিনভাগে বিভক্ত হইলেও, ষট্‌পদী শ্রেণীর দেহের সঙ্গে ইহাদের দেহগঠনের সাদৃশ্য খুবই কম। ষট্‌পদী প্রাণীর ন্যায় ইহাদের মাথা একটি পৃথক খণ্ডে কখনও বিভক্ত থাকে না। বৃশ্চিকের সঙ্গে ষট্‌পদী শ্রেণীর যে কোন একটি প্রাণিদেহ তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। ইহাদের দেহের প্রথম খণ্ডে মস্তক ও বক্ষঃস্থল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে উদর ও লেজ। লেজের ছয়টি খণ্ডের শেষ খণ্ড, হুলের আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মুখের সম্মুখে নখরসদৃশ, তিনটি গ্রন্থিবিশিষ্ট এক জোড়া অস্ত্র (chelicerae) আছে। তাহারই কাছে, কোন কিছু ধরিবার সুবিধার জন্য ছয়টি খণ্ডে গঠিত এক জোড়া অঙ্গ (pedipalps) থাকে। ইহাদেরই আবার শেষের দিকের দুইটি খণ্ড মুখের দুইধারে থাকিয়া চর্ব্বণদন্তের কাজ করে। ইহাদের মুখের নীচে, দেহের উভয় পার্শ্বে সাতটি গ্রন্থিযুক্ত, চারিটি চারিটি করিয়া আটখানা পা পরপর সাজান থাকে। চলিবার সময় ইহারা ইহাদের লেজ উপরদিকে তুলিয়া রাখে এবং সুবিধা পাইলেই দংশন করে।

মাদী বিচ্ছু কিছুকালের জন্য তাহার বাচ্চাগুলি পিঠে
করিয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে ইহাও তোমরা দেখিতে
সময় মাদী বিচ্ছু বিপদে পড়িলে বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠ
প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পালাইবার চেষ্টা করে। মায়ের পিঠে তাহারা পরস্পর জড় হইয়া থাকাতে প্রথমতঃ তাহাদিগকে বাচ্চা বলিয়া চিনিতেই অসুবিধা হয়। বৃশ্চিকের ডিম হয় না, ছোট ছোট বাচ্চারই জন্ম হইয়া থাকে।

মাকড়শা

তোমরা ঘরের কোণে, বাগানে, মাঠে, জঙ্গলে—এমন কি জলেও মাকড়শা দেখিতে পাও। মাকড়শাকে ষট্‌পদী কীট বলা যাইতে পারে না। কেননা ঐ জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে ইহার দেহের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।



মাকড়শা ও মাকড়শার জাল

একটি মাকড়শা সংগ্রহ করিয়া নিজেরাই তাহাদের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিও। প্রত্যেক মাকড়শার দেহেই মাত্র দুইটি খণ্ড দেখিতে পাইবে। সম্মুখের অংশে মুখ ও বুক এবং পশ্চাতের অংশে উদর থাকে। ইহাদের মাথায় সাধারণতঃ ছয়টি, ও কদাচিৎ আটটি খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চক্ষু দেখিতে পাইবে। তাহাদেরই কাছে ধারাল ও শক্ত নখের মত যে অস্ত্রগুলি

আছে তাহারই মধ্যে, দুইটি হইতে বিষ নির্গত হইয়া থাকে। যদিও এই বিষ বড় বড় প্রাণীর কোনই অনিষ্ট কবিতে পারে না, তবুও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা—যাহা তাহারা বন্দী কবিয়া থাকে—তাহাদের পক্ষে বড়ই মারাত্মক। ইহাদের পায়ের সংখ্যা ছয়টি না হইয়া আটটি,—সকল গুলিই মাথার নিকট সংলগ্ন। প্রত্যেক পায়ে আবার সাতখানা করিয়া খণ্ড পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ দেখিতে পাইবে। পায়ে ধারাল নখ ও চিরুণীর মত শ্রেণীবদ্ধ কাঁটা আছে। ইহাদের পায়েব তলাতে গদির মত মাংসপেশী থাকে। মাকড়শার উদর বেশ মোটা-সোটা! উদরের শেষ অংশে, নীচের দিকে সূতা তৈয়ার করিবার জন্য কতকগুলি সূত্রকোষ থাকে। তোমবা মাকড়শার যে জাল দেখিয়া থাক তাহা এই সূতা হইতেই প্রস্তুত হয়।

মাকড়শার জাল প্রস্তুত-প্রণালী বড় সুন্দর। ইহারা যখন জাল বুনিতে থাকে তখন লক্ষ্য কবিয়া দেখিও। যেস্থানে ইহাবা জাল প্রস্তুত করিবে, তাহাব কোন এক যায়গায় সূত্রকোষগুলি লাগাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সূতা বাহির হইতে থাকে। তারপব বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন আশ্রয়ের সঙ্গে প্রথমতঃ সূতাব টানাদিয়া, আপনার আবশ্যক মত ছোট-বড় জাল প্রস্তুত করিয়া নেয়। ইহাদের জাল এক একটি কীট-পতঙ্গ বন্দী করিবার ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নহে। জালে পা দিলেই পোকা কিংবা ফড়িংএর আর রক্ষা নাই। তাহারা জালের আঠাতে আটকাইয়া একেবারে অচল হইয়া পড়ে, এবং মরিয়া যায়।

যদিও মাকড়শাব ডিম তোমাদের নজরে পড়ে নাই, তবুও ইহাদের গুটি তোমরা প্রায় সকলেই দেখিয়াছ। তোমরা ঘরের কোণে যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় মাকড়শা দেখিতে পাও, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বুকের নীচে, সাদা চেপ্টা 'মাণিবেগের' মত একটি গুটি থাকে। ইহা ছিঁড়িলে ইহার ভিতরে মাকড়শার অসংখ্য ছানা দেখিতে পাইবে।

পৃথিবীতে ছোট-বড় অনেক রকম মাকড়শা আছে। কোন কোন মাকড়শা বেশ বড় এবং শক্তিশালী। মর্দ্দা মাকড়শা মাদী মাকড়শার চাইতে

আকারে অনেক ছোট। মর্দ্দা মাকড়শার কাজ ফুরাইয়া গেলে মাদী মাকড়শা তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলে। এমন কি অধিকাংশ সময় তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

এ ছাড়া আর কতকগুলি মাকড়শা আছে, যাহারা অধিকাংশ সময় জলের ভিতরেই বাস করে। তাহাদের ডিম, গুটি এবং বাচ্চা জলের ভিতরেই জন্মিতে দেখা যায়। ইহারা অধিকাংশ সময় জলের ভিতরেই বাস করে বলিয়া অনুসন্ধান না করিলে সচরাচর চক্ষে পড়ে না। এরূপ একটি মাকড়শার ছবি এখানে দেওয়া হইল। তোমরা এই মাকড়শা ও তাহার বাসা ইত্যাদি, আমাদের দেশের পুকুর ও অন্যান্য জলা যায়গায় অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিও।

এই মাকড়শার আকৃতি এবং প্রকৃতি অধিকাংশ বিষয়েই স্থলচর মাকড়শা-সদৃশ হইলেও, ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ তফাৎ যে নাই তাহা নহে। জলচর মাকড়শা অধিকাংশ সময় জলে বাস করিলেও ইহারা বায়ু ছাড়া বাঁচিতে পারে না। জলের উপর হইতে বায়ু সংগ্রহ করিয়া নিয়া ইহারা জলের নীচে চলিয়া যায়। সেই বায়ুর সাহায্যে তাহারা অনেকক্ষণ অনায়াসে জলের ভিতর বাস করিতে পারে। বায়ু সংগ্রহের সুবিধার জন্য তাহাদের দেহে নালার মত দাগকাটা আছে, তাহাতে তাহারা বায়ু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। ইহাদের



জলচর মাকড়শা

দেহে প্রচুর লোম আছে, তাহারাও ইহাদিগকে বায়ু বহন কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে। এছাড়া পিছনের পা দুইটি দ্বারা ইহারা জলমধ্যে মস্তবড় একটি বুদ্‌বুদ্‌ বহন করিয়া নিয়া যায়। এই বুদ্‌বুদ্‌ বহন করিয়াও জলের মধ্যে

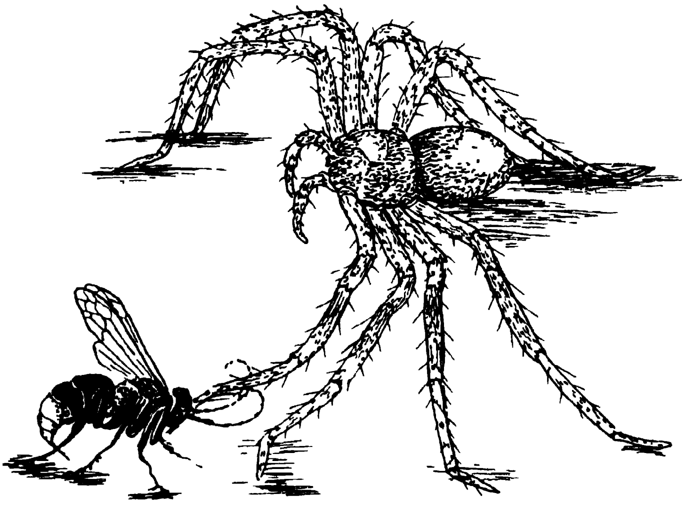
তাহারা বিচরণ করিতে পারে। জলচর মর্দ্দা মাকড়শা মাদী মাকড়শার চাইতে আকারে বড় হয়।

ডিম পাড়িবার সময়, এই মাকড়শা জলের নীচে একটি গোলাকার বাসা প্রস্তুত করে, এবং তাহার মুখ নীচের দিকে খোলা থাকে। বাসা প্রস্তুত হইলে পর তাহারা জলের উপর চলিয়া আসে এবং সর্ব্বদেহ বায়ুপূর্ণ করিয়া, জলের নীচে বাসার ভিতর চলিয়া যায়। এইরূপে সংগৃহীত বায়ু তাহারা বাসার ভিতরে ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে বাসার উপর দিকে কতক যায়গা ফাঁকা হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত বাসার ভিতর সম্পূর্ণ বায়ুপূর্ণ হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপে পুনঃ পুনঃ জলের উপর হইতে বায়ু সংগ্রহ করিয়া বাসার ভিতরে বায়ু সঞ্চয় করিতে থাকে। বাসা বায়ুপূর্ণ হইলে পর তাহারা তাহাতে ডিম পাড়ে। ইহাতে ডিমগুলি যদিও জলের ভিতরেই থাকে, তথাপি জলে ভিজিতে পারে না। দেখ কি অভিনব উপায়েই ইহারা ইহাদের ডিমগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে! ডিম হইতে বাচ্চা হইলে পরও তাহারা কিছুকাল সেখানে বাস করে। ডিমগুলি বাসার ভিতরে একটা গুটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। প্রত্যেক গুটিতে প্রায় শতাধিক ডিম দেখিতে পাওয়া যায়। ডিমগুলি আকারে গোল এবং খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। তাহারা কখনও শামুকের ডিমের মত জমাট বাঁধা থাকে না; পরস্পর আল্‌গা আল্‌গা ভাবে থাকে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ছবিতে বাসাব ভিতরে লক্ষ্য করিলেই এইরূপ একটি গুটি দেখিতে পাইবে।

জলচর মাকড়শাব দেহ জল হইতে উঠিয়া আসা মাত্রই, স্থলচর মাকড়শার দেহের ন্যায় শুষ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। জলে থাকিলেও ইহাদের দেহ জলে ভিজিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, ইহাদের প্রায় সর্ব্বাঙ্গ সংগৃহীত বায়ু দ্বারা আবৃত থাকাতে জল ইহাদের চর্ম্ম স্পর্শ করে না, সুতরাং ইহাদিগের দেহ আর্দ্র দেখিবার কোন কারণ নাই।

মাকড়শা বহু কীট-পতঙ্গ বধ করিয়া নিজেদের শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় দিলেও, কাঁচপোকার কাছে তাহারা বড়ই জব্দ হয়। কাঁচপোকা

যে, সব সময় মাকড়শার চাইতে আকারে বড় থাকে তাহা নহে, তবুও তাহাব সাথে কিছুতেই মাকড়শা পারিয়া উঠে না। তোমাদেব কাহারও চক্ষে পড়িয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু কাঁচপোকা এবং মাকড়শার গতিবিধি লক্ষ্য করিলেই মাকড়শার দুর্দ্দশা দেখিতে পাইবে। কাঁচপোকা তাড়াতাড়ি উড়িয়া আসিয়া মাকড়শাব পিঠে সহসা হুল বসাইয়া দেয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে



কাঁচপোকাব মাকডশা শিকাব

মাকড়শা একেবারে অচল হইযা পড়ে। এরপরও যদি নড়াচড়া করে, তবে আবার তাহার পিঠে পূর্ব্বের মত হুল বসাইয়া দেয়। মাকড়শা তখন জীবন্মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, আর কাঁচপোকা তাহাকে টানিয়া তাহার বাসার দিকে নিয়া যাইতে থাকে। এখানে যে ছবি দেওয়া হইল তাহাতে দেখ কেমন একটি ছোট্ট কাঁচপোকা একটি বেশ বড় মাকড়শাকে টানিয়া নিয়া যাইতেছে।

আঠালী

জলে, স্থলে, উদ্ভিদ এবং প্রাণিদেহের উপর নানা রকমের আঠালী জন্মিয়া থাকে। গৃহপালিত কুকুর, বিড়াল এবং গাভীর গায়ে যে আঠালী হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিও। কচি অবস্থায় ইহাদের মাত্র তিন জোড়া পা থাকে। বড় আঠালীতে গ্রন্থিযুক্ত আটটি পা দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ আঠালী তেমন অনিষ্টকারী না হইলেও ইহারা কোন কোন রোগের বীজ বহন করিয়া থাকে। ইহারা প্রাণিদেহ হইতে রক্তশোষণ করিয়া জীবনধারণ করে। আঠালী মাত্রেই লূতাদিবর্গের অন্তর্গত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শম্বুকাদি প্রাণিবর্গ

(Mollusca)

শামুকের অন্য নাম শম্বুক। তাহা হইতেই এই শ্রেণীর নাম শম্বুকাদি বর্গ। ইহারা অধিকাংশই জলজ প্রাণী। ইহাদের সকলেরই দেহ খুব কোমল এবং গ্রন্থিবিহীন; হাত পা ইত্যাদি অঙ্গের কোন চিহ্ন নাই। সাধারণতঃ ইহাদের দেহ এক প্রকার চর্ম্মের আবরণে আবৃত থাকে। সেই আবরণ হইতে নিঃসৃত এক প্রকার চূণা পদার্থের (Calcium carbonate) দ্বারা ইহারা ইহাদের কোমল দেহের বাহিরে একটি কঠিন খোলসের উৎপাদন করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর প্রাণিদেহের ভিতরে শিরা-উপশিরার উত্তমরূপ বিন্যাস থাকাতে ইহাদের স্থান, সাধারণতঃ সকল মেরুদণ্ড-হীন প্রাণীর উপরে। কিন্তু বর্ত্তমানে কণ্টকচর্ম্মী নামক সামুদ্রিক ইতরপ্রাণী (Echinoderm) শম্বুকাদি প্রাণিবর্গের উপরে স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাদের চর্ম্মাবরণের ভিতরে যে গর্ত্ত আছে তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিবার জন্য ফুল্‌কো আছে। মুখের ভিতরে একসারি দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সাহায্যেই ইহারা ইহাদের খাদ্য খাইয়া থাকে। স্থলচর শামুকের ফুল্‌কোর যায়গায় শুধু শ্বাস-কোষ (pulmunary chamber) থাকে। তাহার আবরণেই ফুস্‌ফুসের কাজ করিয়া থাকে। স্থলচর শামুকের মধ্যে কোন কোন শামুক উভলিঙ্গের মতই ডিম্ব উৎপাদন করে। সকল রকমের শাঁখ, শামুক, ঝিনুক, সমুদ্রজাত ভীষণাকার অষ্ট-পাশ (Octopus) প্রভৃতি প্রাণী এই শ্রেণীরই অন্তর্গত।

এই সকল প্রাণীকে, তাহাদের মাথা, থাকা না থাকা ও অবস্থান অনুযায়ী তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। মস্তকহীন,—উদাহরণ ঝিনুক। ২। মাথাবিশিষ্ট,—নানা রকম শামুক ইহাদের উদাহরণ। ৩। পা-সংযুক্ত এবং মাথাবিশিষ্ট,—উদাহরণ সমুদ্রজাত অষ্ট-পাশ (Octopus) এবং কাটল্ মাছ।

১। মস্তকহীন শম্বুকাদিবর্গ

ঝিনুক

কুড়ুলপদী (Pelecypoda)

ঝিনুক তোমরা বহু দেখিয়াছ। সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে ঝিনুক উৎপন্ন হয়। এমন কি আমাদের দেশে নদী, খাল, বিল, পুকুরেও ইহাদের অভাব নাই। সুতরাং যদি কেহ এ পর্য্যন্ত ঝিনুক না দেখিয়া থাক, তবে ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাব। শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন রকমের ঝিনুক আছে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই উহা খাদ্যরূপে পরিগণিত। ইহাদের মাথার অংশ সর্ব্বদাই অসম্পূর্ণ থাকে। চক্ষু, শুঁয়া, কোন রকম দাঁত কিংবা জীব্, ইহাদের কিছুই থাকে না। মুখের এক কিনারে শুধু একজোড়া ঠোঁট দেখিতে পাওয়া যায় (labial palp)। ইহাদের তথাকথিত পায়ের আকার কতকটা কুড়ুলের মত বলিয়া ইহাদিগকে কুড়ুলপদী (Pelecypoda) বলা হয়। ইহাদের ফুল্‌কোর আকার সূত্রযুক্ত এবং কিনারা কাটা রেকাবের মত। ইহারই সাহায্যে তাহারা জলে ঢেউএর সৃষ্টি করিয়া খাদ্য দ্রব্য ও ওজনবাষ্প মুখের ভিতর



ঝিনুক

ঢুকাইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌ই ঝিনুকেব খাদ্য। পুংস্ত্রী-ভেদে ঝিনুক দুই রকমের, কিন্তু উভলিঙ্গ ঝিনুকেব সংখ্যাই বেশী। ডিম হইতেই ইহাদেব বাচ্চা হয়। যুক্তপ্রদেশেব অধিবাসীদিগের নিকট ঝিনুক একটি জাতীয় খাদ্যরূপে পরিগণিত। সেখানে অগভীর সমুদ্রেব তীরেব কাছে, বহুশত একর বিস্তৃত ভূভাগ, ঝিনুকচাষের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও চীনদেশে ঝিনুকেব দোকান ছিল।

জন্মিবাব সময় বাচ্চা ঝিনুক এত ক্ষুদ্র থাকে যে, খালি চোখে জলের উপর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন তাহাদের মোটেই কোন খোলস থাকে না, মাত্র খানিকটা জেলীব মত দেখায়। এই সময় তাহারা জলে সাঁতাব কাটিতে থাকে এবং স্রোতেব টানে বহুদূর ভাসিয়া যায়।

এরূপভাবে তাহারা যে কত দিন ভাসিতে থাকে তাহাব ঠিক নাই; হয়ত সপ্তাহ খানেক হইতে পাবে। কচি অবস্থায় এরূপ সহস্র সহস্র ঝিনুক মাছেব পেটে ও সমুদ্র-স্রোতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কয়েক দিন ভাসিযা বেড়াইবাব পব দেহ-নিঃসৃত চূণাপদার্থে ক্রমে ক্রমে যখন তাহাদেব কোমল দেহেব উপব কঠিন আবরণ অর্থাৎ খোলস গঠিত হইতে থাকে, তখন তাহারা ওজনেও ভাবী হইতে থাকে, সুতবাং শীঘ্রই জলের তলায় ডুবিয়া যায়। সেখানে কাঠ, পাথর কিংবা অন্য যাহা কিছু অবলম্বন পায় তাহাই জড়াইয়া ধবিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত খোলসের মুখ বিস্তৃত করিয়া তথায় বসিয়া থাকে। তখন জলস্রোতের সহিত খাদ্য-দ্রব্য মুখের ভিতরে ঢুকিতে থাকে। তাহা খাইয়াই ঝিনুক ক্রমশঃ মোটা ও বড় হয়।

ঝিনুকের ভিতবে মুক্তার উৎপত্তির কথা তোমরা হয়ত শুনিয়াছ। কিন্তু কিরূপে যে উৎপন্ন হয় তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। সে আবার এক মজার কথা। ঝিনুক যখন খোলসের মুখ বিস্তার করিয়া জলের তলায় বসিয়া থাকে, তখন ইহাদের খাদ্য ছাড়া মাছের ডিম, জীবাণু, বালিকণা

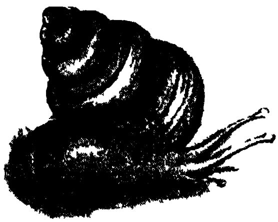
কিংবা যাহা কিছুই জলস্রোতের সঙ্গে ভিতবে ঢুকিয়া পড়ে. তাহা তাহারা বাহির করিয়া দিতে পারে না। আবার কোমল ঝিনুকের দেহ খরখরে কোন জিনিষের স্পর্শও সহ্য করিতে পারে না। সেজন্যই ঝিনুকের খোলসের ভিতরের দিক, বাহিরের দিকের চেয়ে মসৃণ। ভিতরকার খরখরে অনাবশ্যক জিনিষ যখন তাহারা বাহির করিয়া দিতে পারে না, তখন শরীর হইতে এক প্রকার মসৃণ তরলপদার্থ নির্গত করিয়া ইহাকে সকল দিকে আবৃত করিয়া ফেলিলে পর, এই তরল পদার্থ শুকাইয়া কঠিন ও মসৃণ হইয়া যায়। এইরূপ তবলপদার্থ দ্বারা বার বার আবৃত করাতে ইহা ক্রমশঃ বড় দানাব আকার ধারণ করে। ঝিনুকেব বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই মুক্তার আকারও বাড়িতে থাকে। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি, তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিও। ঝিনুক যেমন বড় হইতে থাকে সে এই পদার্থ তাহাব ভিতবদিকের খোলসেও সঞ্চয় কবিতে থাকে, ইহাতে বাহির দিকে ঝিনুকের খোলস, অনবরত ক্ষয় হইয়া গেলেও ইহা সমান মোটাই থাকিয়া যায়। তারপর খোলসের ভিতবকার বর্ণ সব সময় ততটা উজ্জ্বল না হইলেও মুক্তারই যে অনুরূপ তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে। ইহা দ্বারাই চক্‌চকে বোতাম এবং ছড়ির বাট ইত্যাদি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে ও সিংহল দ্বীপে প্রত্যেক বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে কয়েক সপ্তাহের জন্য মুক্তাসংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে। খালি গায়ে ডুবাইয়া কিংবা ডুবুরীর পোষাক পরিয়া, লোকে মুক্তার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি ঝিনুক সংগ্রহ করে।

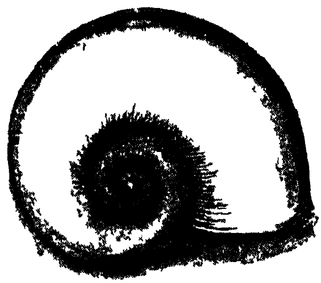
২। মাথাবিশিষ্ট শম্বুকাদিবর্গ

গুগলি ও জলচর শামুক

বর্ষাকালে পুকুব কিংবা নদীর ঘাটে অনুসন্ধান করিলেই বহু জলচর শামুক এবং গুগলি দেখিতে পাইবে। গুগলি প্রায় সকল সময়ে এবং সকল জলাশয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আকারে শামুকের চাইতে ছোট হইলেও, দেহেব গঠন-প্রণালী সাধারণতঃ দেখিতে প্রায় শামুকেরই মত। মানুষের মধ্যে আবাব কোন কোন জাতি গুগলি খাইয়া থাকে। ইহাদের



গুগলি



জলচব শামুক

যে কঠিন আববণটি তোমবা দেখিয়া থাক তাহা তাহাদেব থাকিবার ঘর। সেই ঘরে আবাব একটি কপাট আছে। তোমরা জল হইতে তুলিয়া আনিবার সময় দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তাহাদের কোমল অঙ্গ গুটাইয়া, আবরণ বা খোলসের ভিতর নিয়া যায় এবং তাড়াতাড়ি কপাট বন্ধ করিয়া ফেলে। কোন পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তাহাদের আবরণের কপাট খুলিয়া বাহির হইয়াছে এবং আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আপাততঃ দেখিতে একরকম হইলেও ইহাদের অঙ্গের ভিতবকার গঠন, সকলের ঠিক একরকম নয়। জলচর শামুকের যেমন জলের ভিতরে বায়ু সংগ্রহের উপযুক্ত যন্ত্র অর্থাৎ ফুল্‌কো আছে, তেমনি আবার ডাঙ্গার উপর শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার উপযুক্ত যন্ত্রও

আছে। এ জন্য ইহারা জল স্থল উভয় যায়গাতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। জল ছাড়া গুগলি বাঁচিতে পারে না। কেননা তাঁহাদের ডাঙ্গায় শ্বাস নিবার কিংবা ফেলিবার মত যন্ত্র নাই। সেইরূপ, স্থলচর শামুক জলের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহাদের তেমন কোন উপায় নাই। তাহাদিগকে জলে ডুবাইয়া রাখিলেই মরিয়া যায়। তাহাদিগের আবরণের মুখ বন্ধ করিবার মত কোন কপাটও থাকে না। তাহারা অন্য উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। এ সকল বিষয় তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিও।

পাকান আবরণ ছাড়া, তাহাদের কোমল দেহে আর কোন হাড় নাই। কুণ্ডলী কোন্ দিকে মোচড়ান ইত্যাদি বিষয়ও তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। ইহারা চলিবার সময় ভিতর হইতে এক প্রকার জলীয় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের চলিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

চলিবার সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ইহাদের মাথায় চারিটি শুঁড় দেখিতে পাইবে। তাহাদের মধ্যে দুইটি লম্বা এবং দুইটি কিঞ্চিৎ খাট। ইহাদের দ্বারা তাহারা তাহাদের পথের অবস্থা অর্থাৎ বাধাবিঘ্নের বিষয় বুঝিতে পারে। লম্বা দুইটি শুঁড়ের অগ্রভাগে দুইটি ছোট ছোট চোখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মুখে নীচের দিকে সারিবদ্ধ অভিনব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত আছে। উহাদের সাহায্যে ইহারা কচি পাতার কোমল অংশ খাইয়া জীবনধারণ করে। শীতকালে ইহারা কপাট বন্ধ করিয়া সাধারণতঃ নিশ্চল অবস্থায় ঘুমাইয়া থাকে। ইহাদের খোলসের উপর অনেক সময় শেওলা জন্মে। সাময়িক এরূপ নিশ্চল অবস্থায় থাকাতেই, ইহাদের আবরণের উপর শেওলা জন্মিবার সুবিধা হয়।

ইহারা এক যায়গায় অনেকগুলি সাদা গোলাকার ডিম পাড়িয়া থাকে, এই ডিমের আবরণ চূণাপদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত ও ভঙ্গপ্রবণ। ডিমগুলি একত্রে জমাট বাঁধিয়া থাকে। বর্ষাকালে জলা যায়গায় বিশেষতঃ ধানক্ষেতের ধারে, এরূপ বহু ডিম দেখিতে পাইবে।

৩। পা-সংযুক্ত এবং মাথাবিশিষ্ট শম্বুকাদিবর্গ

অষ্ট-পাশ ও কাটল্ মাছ

(Octopus & Cuttle fish)

শম্বুকাদি প্রাণিবর্গের মধ্যে অষ্ট-পাশের মত ভীষণ প্রাণী আর নাই। ইহারা আকারেও যেমন বড়—প্রকৃতিতেও তেমনি হিংস্র! কাটল্ মাছ নামক যে একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণী পুরী ও মাদ্রাজ অঞ্চলে মানুষের খাদ্যরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহারা ইহারই ছোট ভাই। আকারে ছোট হইলেও উহারা অষ্ট-পাশেরই মত হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট। এই উভয়েরই মস্তকে আটটি করিয়া হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা পা আছে। অষ্ট-পাশ সাধারণতঃ এইগুলি গুটাইয়া বসিয়া থাকে। শিকার কাছে আসিলেই



অষ্ট-পাশ বন্দী শিকার খাইতেছে

তাহার পা-গুলি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া যায় এবং তাহাদ্বারা সে শিকারের দেহ এরূপভাবে সাপের মত জড়াইয়া ধরে যে, শিকার পলাইয়া যাওয়ার আর

কোন উপায় থাকে না। ইহাদের পায়ের উপরে বাটীর আকারের বহু শোষণযন্ত্র আছে। অষ্ট-পাশ বহু বড় বড় প্রাণী বধ করিয়া খায়। আর কাটল্ মাছ নিজের শক্তি অনুসারে জ্যান্ত মাছ, কাঁকড়া, ঝিনুক ইত্যাদি বধ করিয়া খায়। বড় বড় কাটল্ মাছ, এমন কি মানুষকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। কাটল্ মাছ একবার কোনমতে মানুষের হাত জড়াইয়া ধরিলে তাহার শুঁড়গুলি না কাটিয়া হাত আর কখনও মুক্ত করা যায় না। উহাদের উভয়েরই চক্ষু বেশ বড় বড়। ছবি দেখিলেই তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। কাটল্ মাছের আটটি হাত ছাড়া আরও অতিরিক্ত লম্বা দুইটি হাত আছে। উহাদের মুখে কাকাতুয়ার ঠোঁটের মত বাঁকা ঠোঁট এবং ভয়ানক রকমের একটি জিব্ আছে।



কাটল্ মাছ

একটি বড় অষ্ট-পাশের শুঁড় ৭০।৫০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। ইহাদের সকলেরই কালিভরা এক একটি থলি আছে। শত্রু পিছু নিলে ইহারা সেই কালি ছাড়িয়া সমুদ্রজল কালো করিয়া ফেলে। সুতরাং শত্রু আর তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। ইহাদের আত্মরক্ষার পন্থাও দেখ কেমন অভিনব! ইহাদের এই কালি হইতেই চিত্রকরদের ব্যবহারের জন্য সিপিয়া নামক কাল রং প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

কণ্টকচর্ম্মী

(Echinoderma)

কণ্টকচর্ম্মী নাম হইতেই বুঝিতে পারিতেছ যে, এই শ্রেণীর প্রাণীর চর্ম্ম একপ্রকার কাঁটার দ্বারা আবৃত। অধিকাংশ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণই ইহাদিগকে শূন্যগর্ভ কীটের উপরে স্থান দান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সমুদ্রজাত তারা মাছ (Star fish), কণ্টকাবৃত সাগরাণ্ড (Sea Urchins) ও সাগর শশা (Sea cucumber) প্রভৃতি প্রাণী, অপরূপ আকারের জন্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। এই সকল অদ্ভুত নাম হইতেই ইহাদের আকার যে কিরূপ হইবে অনুমান করিতে পার। ইহাদের নামের সঙ্গে যথাক্রমে মাছ, অণ্ড অর্থাৎ ডিম এবং শশা সংযুক্ত দেখিতেছ। কিন্তু মনে রাখিও তারা মাছ জলে জন্মিলেও মাছ নয়। কণ্টকাবৃত সাগরাণ্ড গোলাকার হইলেও ডিম নয়; এবং সাগর শশা আকারে কতকটা শশা ফলের মত হইলেও ইহা নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ব্যতীত আর কিছুই নহে। কণ্টকচর্ম্মীর দেহ একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিকে নিয়মিত ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া গঠিত হয়। ইহাদিগের ছবির দিকে লক্ষ্য করিলেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে। তাহারা তাহাদের নলাকারের পা দ্বারা ইতস্ততঃ নড়াচড়া করে। এই পা-গুলি ভিতর দিক হইতে জলপূর্ণ। ইহাদের শেষ প্রান্ত আবার শোষণযন্ত্রে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাদের কীটডিম্বগুলির দেহও উভয়দিকে সমভাবে গঠিত। চূর্ণাপদার্থ সঞ্চিত হইয়া ইহাদের দেহে পঞ্জরের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেহে রক্ত চলাচলের যেমন শিরা আছে, ইহাদের দেহে তেমনি জল চলাচলের জন্য পাঁচদিকে পাঁচটি নল বা শিরা আছে। দেহের কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে ইহারা তাহা পুনর্বায় গঠন করিতে পারে।

তারা মাছ

(Star fish)

ছোট-বড় বহু রকমের তারা মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কোনটির অঙ্গ ভঙ্গপ্রবণ, কোনটির অঙ্গ পালকের মত, আবার কোনটির অঙ্গ অঙ্গরীর মত। সকল ক্ষেত্রেই ইহাদের আকৃতি কতকটা তারার মত বলিয়া ইহাদিগকে তারা মাছ, নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের দেহের মধ্যবর্ত্তী গোলাকার অংশ হইতে আমাদের অঙ্গুলীর মত পাঁচটি অঙ্গ ক্রমশঃ সরু হইয়া পরিধির দিকে সমভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে তারার মত দেখায়। ইহাদের দেহ চর্ম্মজ কাঁটায় আবৃত এবং মুখ নীচের দিকে অবস্থিত। আমাদের দেহের রক্ত চলাচলের শিরার মত ইহাদের দেহের মধ্যবিন্দু হইতে জল চলাচলের জন্য পাঁচ দিকে পাঁচটি নল বা শিরা আছে। ইহারই দুইদিকে নলাকারের ছোট ছোট পা-গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজান থাকে। এই পাগুলির সাহায্যে সমুদ্রের তলাতে এই পাঁচ দিকের যে কোন দিকে ইহারা সহজেই গমনাগমন করিতে পারে। সকল দিকেই ইহাদের দেহ সমভাবে বর্দ্ধিত, তাই ইহাদের মাথা বলিয়া বিশেষ কোন অঙ্গ নাই। ইহারা যখন যেদিকে ইচ্ছা চলিতে পারে, তাহাতে কোন অসুবিধা হয় না। যে কোন পাঁচটি অঙ্গের একটি অঙ্গ পৃথক হইয়া গেলে পর, তাহার স্থানে নূতন আর একটি অঙ্গ গঠিত হয়। এমন কি সেই বিচ্ছিন্ন একটি অঙ্গের সঙ্গে আর চারিটি নূতন অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র আর একটি তারা মাছের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। ইহাদের



তারা মাছ

ক্ষুধা অত্যন্ত ভীষণ। শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি জন্তু ইহাদের খাদ্য। ইহারা পাঁচটি অঙ্গুলী বা অঙ্গদ্বারা ইহাদের শিকার এত জোরে চাপিয়া ধরে যে, শিকারের খোলস যত কঠিনই হউক না কেন তাহা নিশ্চয়ই খুলিয়া যাইবে। তারপর খোলসের ভিতরকার কোমল অংশ খাইয়া ইহারা জীবনধারণ করে।

কণ্টকাবৃত সাগরাণ্ড

(Sea Urchins)

কণ্টকাবৃত সাগরাণ্ড আর একটি আশ্চর্য্যজনক প্রাণী। ইহার ডিম্বাকৃতি দেহ বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ইহার দেহের উপর কঠিন খোলসের আবির্ভাব হয়। ক্রমে ক্রমে এই দেহের উপব গ্রন্থিযুক্ত শতশত ক্ষুদ্র কাঁটা জন্মে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি ইহারা ইহাদেব পা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ইহাদের কাঁটাগুলি খোলসের উপর হইতে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তখন ইহাদের খোলস আলোব কাছে ধরিলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ও চোয়ালের কঠিন হাড়সংযুক্ত মুখের



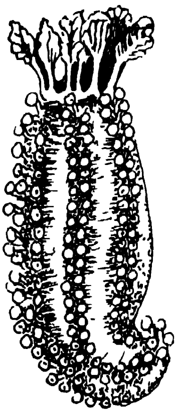
সাগবাণ্ড

একটি অপেক্ষাকৃত বড় গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। চলিবার সময় ইহাদের মুখ নীচের দিকে থাকে। ইহাদের খোলসের ভিতরে যথেষ্ট ফাঁক থাকে এবং তাহার ভিতরেই ইহাদেব যা কিছু নাড়ীভুড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র প্রাণীও সমুদ্রজাত উদ্ভিদ্‌ই ইহাদের খাদ্য। নাবিকেরা ইহাদিগকে সাগবাণ্ড (sea egg) বলে এবং মুবগীর ডিমের মত রন্ধন করিয়া খাইতে ভালবাসে।

সাগর শশা

(Sea cucumbers)

সাগর শশার আকার লম্বা পোকার মত। ইহার মুখ দেহের এক প্রান্তে অবস্থিত এবং কতকগুলি শুঁয়াব দ্বারা পরিবেষ্টিত। গায়ের ত্বক্ সাধারণতঃ কোমল চামেরই অনুরূপ। ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাব দেহের খোলস পাঁচভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ইহাদের নলাকারের পাগুলি শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকে, নড়িবার চড়িবার পক্ষে কিছুমাত্রও কাজে লাগে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীই ইহাদের প্রধান খাদ্য।



সাগব শশা

সাগর শশা আবার বিভিন্ন রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে গবর্ণমেণ্টের মৎস্যবিভাগ কর্ত্তৃক এক প্রকার সাগর শশা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়, এবং শুকাইয়া খাদ্য রূপে বিদেশে রপ্তানী করা হইয়া থাকে। চীনদেশবাসীদের ইহা একটি পরম উপাদেয় খাদ্য।

এ পর্য্যন্ত তোমাদের অপরিচিত সাগরজলের যে কয়েকটি প্রাণীর কথা বলা হইল, ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলির উদ্ভিদের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাবা যে নিম্নস্তবের ইতরপ্রাণী সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ইহারা ক্ষুদ্র হইলেও, ইহাদের আকার এবং জীবনী যে বাস্তবিকই রহস্যময় তাহা তোমরা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

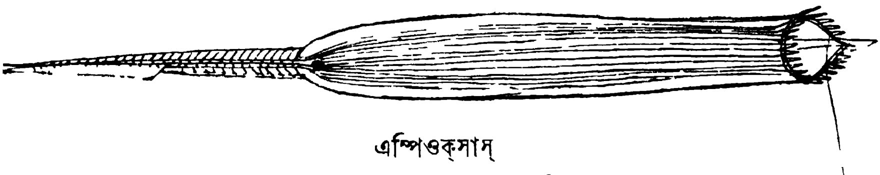

মেরুদণ্ডী প্রাণী

প্রথম অধ্যায়

আদি প্রাচীনতম মেরুদণ্ডী প্রাণী

এই পুস্তকেব আবম্ভে, জীব-জগতেব শ্রেণীবিভাগের আলোচনাকালে, মেরুদণ্ডী প্রাণী কাহাকে বলে তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয়, তাহা তোমাদের মনে আছে। এই মেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মাঝামাঝিও যে প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাব বিষয় তোমাদেব জানা থাকা আবশ্যক। অবশ্য এরূপ প্রাণীর সংখ্যা নিতান্ত কম এবং তাহাবা তোমাদের মোটেই পরিচিত নহে। বিগত শতাব্দীব মধ্যভাগে এরূপ কয়েকটি ক্ষুদ্রপ্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকৃত মেরুদণ্ড যাহাকে বলে তাহা ইহাদেব নাই, তবু ইহাদিগকে কিন্তু মেরুদণ্ডহীন প্রাণী বলা চলে না। কাবণ প্রত্যেক মেরুদণ্ডী প্রাণীরই মেরুদণ্ড গঠিত হইবার পূর্ব্বে যে নোটোকর্ড (Notochord) নামক ভিন্ন বকমেব এক প্রকাব দণ্ডের উৎপত্তি হয়, ইহাদেরও দেহে সেই দণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মেরুদণ্ড কোন সময়েই ইহা হইতে উৎপন্ন হয় না, একথা যদিও সত্য, নোটোকর্ড উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কিন্তু কোন প্রাণীতে আবার মেরুদণ্ডও গঠিত হয় না। নোটোকর্ড মেরুদণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্ব সূচনা মাত্র। এজন্য এই সকল প্রাণীতে মেরুদণ্ড গঠিত না হইলেও, মেরুদণ্ডের পূর্ব্ব সূচনার চিহ্নস্বরূপ, নোটোকর্ড বিদ্যমান থাকাতে ইহাদিগকেও মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তর্গত বলিয়া ধবা হইয়াছে। নোটোকর্ডেই তাহাদের দেহে মেরুদণ্ডেব

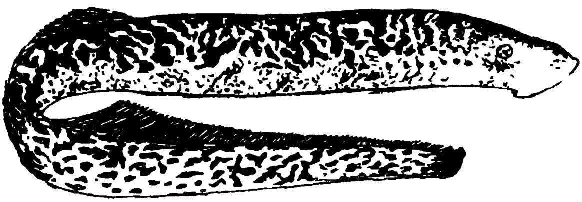
কাজ করিয়া থাকে। এম্পিওক্সাস্ (Ampioxus), বেলানোগ্লোসাস্ (Belanoglosus) প্রভৃতি প্রাণী, এই প্রাচীনতম মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদাহরণ।



এম্পিওক্সাস্

ইহারা উভয়েই সমুদ্র উপকূলে বালি এবং কাদার ভিতরে গর্ত্ত করিয়া বাস করে।

বর্ত্তুলমুখী (Cyclostoma) নামক বাইম মাছের মত এক প্রকার প্রাণীকে, কেহ কেহ সর্ব্ব নিম্নস্তরের মৎস্য বলিয়া ধরিয়া থাকেন। তাহাদের কিন্তু মাছের মত চোয়াল, আঁইস, ফুলকো অথবা পাখ্না জন্মেনা। তা' ছাড়া তাহাদের দেহে সারা জীবন নোটোকর্ড ছাড়া আর কোন মেরু-দণ্ডের উৎপত্তি হয় না। ভারতবর্ষে কোথাও এপর্য্যন্ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।



বর্ত্তুলমুখী

মেরুদণ্ডী প্রাণীর নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চস্তরের প্রাণীর দেহ গঠন লক্ষ্য করিলে, তোমরা ইহাদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের সৃষ্টি, কোন প্রাণী হইতে প্রথম আরম্ভ হইল তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবে। অবশ্য এই বইতেও তাহার উল্লেখ থাকিবে। বর্ত্তুলমুখীতেই প্রথমতঃ মাথার খুলি দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর মাছ হইতে চুয়ালের আরম্ভ। হাতে এবং পায়ে পাঁচ পাঁচটি অঙ্গুলী এবং ফুস্ফুসের সৃষ্টি, উভচর (Amphibious) প্রাণীতেই প্রথম দেখিতে পাইবে। সরীসৃপের ভ্রূণেই প্রথমতঃ ভ্রূণাবরণ (faetal membrane) দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে উচ্চস্তরের প্রাণীর অঙ্গ ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবজগতে ইহা একটি বেশ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৎস্যবর্গ

(Fisces)

মাছ সর্ব্ব নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণী। তাহাদের দেহে শুধু যে মেরুদণ্ড আছে তাহা নহে, মাথার খুলি, পাজরের হাড়ও উৎপন্ন হয়। এমন কি অসম্পূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গও জন্মিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার মাছকে প্রধানতঃ তিনটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। তোমাদের পরিচিত (১) সৌম্যদর্শন (Teleost Type), অধিকাংশ মৎস্যই ইহার অন্তর্গত। (২) ভীষণ দর্শন (Elasmobranch Type),—হাঙ্গর, হাতুরিমুখ হাঙ্গর, করাত মাছ, স্কেইট্ (Skate), তীব্রঘাতী মাছ (Sting-Ray) প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্য এই শ্রেণীর উদাহরণ! (৩) দ্বিশ্বাস যন্ত্রী (Dipnoan Type),—ইহার উদাহরণ পৃথিবীতে খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ইহার উদাহরণ আছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকাতে ইহার দুই একটি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বিশেষ কারণে ইহারা প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কারণটি এই যে, মৎস্যবর্গের উপরেই যে উভচর প্রাণীর (Amphibia) স্থান, তাহার সহিত ইহার শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। ইহাদের ফুল্‌কো এবং ফুস্‌ফুস্, শ্বাস ফেলিবার এই দুইটি যন্ত্রই আছে। এজন্য ইহাদিগকে দ্বিশ্বাসযন্ত্রী বলা হয়। মাছ শুধু ফুল্‌কোর সাহায্যে অম্লজান (Oxygen) বাষ্প গ্রহণ করে। এ বিষয় পুনরায় আলোচনা করা হইবে। ইহারাই মৎস্যবর্গকে উভচর প্রাণীর সহিত সংযোগ করিয়াছে। সংখ্যায় কম হইলেও ইহারা যে পৃথিবীর খুব প্রাচীনতম অধিবাসী তাহা

তাহাদের শিলীভূত দেহ (fossil) দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাদের ডিম উভচরের ডিমের মত অপেক্ষাকৃত বড়।

মাছ জলে বাস করে, এবং জল হইতে তুলিয়া আনিলে কিছু সময়ের মধ্যেই যে তাহাদের মৃত্যু হয় তাহা তোমরা নিশ্চয়ই জান। ইহারা জলে বাস করে বলিয়া ইহাদের শরীর জলে বাস করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী রূপে গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে নদী, নালা, খাল, বিল অথবা পুকুরের ধারে গিয়া মাছের চলাফেরা লক্ষ্য করিলেই, তোমরা ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিবে। জ্যান্ত মাছ জলপূর্ণ টব কিংবা চৌবাচ্চায় ছাড়িয়া দিয়াও তোমরা মাছের গতিবিধি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। মাছগুলি যাহাতে অতি সহজেই জলের ভিতর বিচরণ করিতে পারে, তাহার জন্য মাছের গায়ের শল্ক-গুলি লেজের দিকে মুখ করিয়া চর্ম্মের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে অংশতঃ একটি আর একটিকে আবৃত করিয়া রাখে। ইহাতে শল্কের নীচে জল ঢুকিতে পারে না। অধিকাংশ মাছেরই দেহ শল্কের দ্বারা আবৃত। শিঙ্গী, মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মাছের চামড়ার উপর কোন শল্ক জন্মে না। এই মাছের দেহ একটা পিচ্ছিল আবরণে আবৃত থাকে। অবশ্য শল্কাবৃত মাছেও এই পিচ্ছিল পদার্থ দেখিতে পাইবে, কিন্তু তাহা পরিমাণে এত বেশী নহে। আমাদের যেমন হাত-পা আছে, অধিকাংশ মাছেরও তেমনি আগে পাছে দুই জোড়া পাখ্‌না আছে। এ ছাড়া শিরদাঁড়ার উপরে লেজের আগাতে ও পেটের নীচের দিকে, আরও তিনটি পাখ্‌না দেখিতে পাইবে। ইহারা যাহাতে জলে সাঁতার কাটিয়া অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে, তাহার জন্যই এই পাখ্‌নাগুলি জন্মিয়া থাকে। লেজের অগ্রভাগস্থিত পাখ্‌না দ্বারা ইহারা নৌকার হালের মত আপনাদের গতির দিক নির্ণয় করিয়া থাকে। এই সকল পাখ্‌নার সাহায্যেই ইহারা জলে ইহাদের বিভিন্ন প্রকার গতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। আর একটি কথা তোমরা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যে, ইহাদের লেজের অগ্রভাগের পাখ্‌না সম্মুখদিকে অগ্রসর হইবার পক্ষেও ইহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

সম্মুখদিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ইহাই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রুই, কাতল, এমন কি ছোট ছোট মাছ কাটিবার সময়ও, তোমরা লক্ষ্য করিলে নিশ্চয়ই তুইটি কুঠরী-বিশিষ্ট, একটি ফট্‌কা দেখিতে পাইবে। এই ফট্‌কা হয়ত তোমরা অনেকে অনেকবার ফুটাইয়াছ। মাছ জলের উপরে এবং নীচে গতি নিরূপণের জন্য ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার ব্যবহার-কৌশলও আবার বড় অভিনব। জলের উপরের দিকে চলাফেরা করিতে হইলে, মাছ তাহাদের আবশ্যকমত ইহা গ্যাসপূর্ণ করিয়া ফুলাইয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের জলের উপর ভাসিয়া উঠিবার পক্ষে খুবই সুবিধা হয়। আবার যখন গভীর জলে যাইতে হয় তখন তাহারা এই গ্যাস ছাড়িয়া দেয় এবং অনায়াসে গভীর জলে ডুবিয়া যায়। দেখ মাছের ফট্‌কা তোমাদের খেলার জিনিষ হইলেও, মাছের পক্ষে তাহা কত প্রয়োজনীয়।

অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছও বহু রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। যত বেশী মাছ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবে, ততই মাছ সম্বন্ধে নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারিবে। কতকগুলি মাছ আছে তাহারা ওজনে ভারী বলিয়া, জলের মধ্যে পাঁকের নীচে বাস করে। মাটীর উপর রাস্তা চিনিয়া চলার জন্য তাহাদের শুঁড় থাকে। ইহাদের সাহায্যে তাহারা গন্তব্য স্থানের রাস্তা অনুভব করিয়া চলিতে পারে। আইড়, গুজা, পাঙ্গাশ প্রভৃতি এই শ্রেণীর মাছ। কোন মাছেরই চোখে, আমাদের চোখের মত পাতা নাই। সেজন্য তাহারা পলক ফেলিতে পারে না। জলে কিংবা ডাঙ্গায় তাহাদের চোখ সর্ব্বদাই খোলা দেখিতে পাইবে।

ভিন্ন ভিন্ন মাছ তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকম জলাশয়ে বাস করিতে দেখা যায়। মাছ পরীক্ষাকালে তোমরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করিবে। অধিকাংশ সামুদ্রিক মাছই, নদী-নালার অপেক্ষাকৃত পাতলা জলে বাঁচিতে পারে না। আবার নদী-নালার পাতলা জলে যে সকল মাছ বাস করে, তাহারা সমুদ্রের ভারী লোনা জলের চাপ সহ্য করিতে পারেনা। এজন্য

সামুদ্রিক মাছও নদী-নালার মাছের মধ্যে, কিঞ্চিৎ পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি সমুদ্রের উপরিভাগে, অপেক্ষাকৃত গরমজলে যে সকল মাছ বাস করে, তাহারা যদি সমুদ্রের তলদেশে ঠাণ্ডা জলে গমন করে, তবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবার গভীর ঠাণ্ডা জলের মাছ, কখনও সমুদ্রের উপরিভাগে বিচরণ করে না।

মাছগুলি যখন জলে বাস করে তখন তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা অনবরতই জলপান করিতেছে। বাস্তবিক কিন্তু তাহারা জলপান করে না। তাহারা এইরূপে জল টানিয়া, তাহাদের শ্বাস ফেলিবার অঙ্গ-স্বরূপ ফুল্‌কোগুলিকে আর্দ্র রাখে। জল হইতে অম্লজান-বাষ্প (Oxygen) সংগ্রহ করিয়া কানকোর নীচ দিয়া সেই জল পুনরায় বাহির করিয়া দিয়া থাকে। মাছের রক্ত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা এবং তাহাদের হৃদয়ে মাত্র তুইটি কুঠরী। ইহারা নাকের ছিদ্র দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে না, শুধু ঘ্রাণের জন্যই ইহাদের ব্যবহার করে। ইহারা ডিম্ব প্রসব করিবার সময় একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকে। কতকগুলি মাছ জলজ উদ্ভিদ্ খাইয়া জীবনধারণ করিলেও অধিকাংশ মাছই গুগ্‌লি ও নানাপ্রকার পোকা খাইয়া থাকে। এমন কি তাহারা একে অন্যকে খাইতেও কুণ্ঠিত হয় না।

যে সকল মাছ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। তাহাদের মধ্যে কৈ, মাগুর, শিঙ্গী, লেটা, শোল, বোয়াল, গজার, খলিশা, পুঁটি, বাটা, ভেট্‌কি, রুই, কাতল, চিতল্, মৃগেল, আইড়, গুজা, পাঙ্গাশ প্রভৃতি মাছ তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। ইহাদের আকার ও গঠন পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিও এবং সম্ভব হইলে জলের মধ্যে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবারও চেষ্টা করিও। পর পর কয়েকটি মাছের সাধারণ বিবরণ দেওয়া হইল, প্রথমতঃ ইহাদিগকেই পরীক্ষা করিবে। ইহারা সকলেই সৌম্য-দর্শন এই উপশ্রেণীর অন্তর্গত।

সৌম্য দর্শন মৎস্য (Teleost Type)

এই শ্রেণীর মাছ সমুদ্র, নদী নালা, খালবিল প্রভৃতি সকল রকম জলাশয়েই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে ইহাদের সকলেরই মুখ, দেহের অগ্রভাগে অবস্থিত। চক্ষু দুইটি দেহের অনুপাতে বেশ বড়। ফুলকোগুলি, কানকোর দ্বারা আবৃত ও সুরক্ষিত। ইহাদের দেহের দুইধারে কান্‌কো হইতে দুইটি রেখা সমভাবে লেজ পর্য্যন্ত অঙ্কিত থাকে। লেজ সাধারণতঃ মাঝখানে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই শ্রেণীর যে কয়েকটি মাছের বিষয় এখানে বলা হইল তাহাদিগকে তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিও।

কৈমাছ আমাদের দেশের প্রায় সকল যায়গাতেই জ্যান্ত অবস্থায় সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এই মাছের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেগুলি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিও।

কৈমাছের পাখ্‌নাগুলির মধ্যে, পিঠের অর্থাৎ শিরদাঁড়ার উপরকার ও পেটের নীচের পাখ্‌না দুইটি বেশ বড়, এবং কতকগুলি সারিবদ্ধ কাঁটা, পাতলা চর্ম্মের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। খলিশা মাছেও এরূপ পাখ্‌না আছে বটে, কিন্তু তাহাদের কাঁটা কৈমাছের মত তেমন দৃঢ় নহে। এই মাছের কান্‌কোর নীচের দিকের কিনারা দাঁতকাটা থাকাতে, ইহারা এই কান্‌কোর সাহায্যে মাটির উপর দিয়াও চলিয়া যাইতে পারে। ইহারা খাল, বিল, পুকুরেই বেশী পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টি হইলেই ইহারা দলে দলে মৃতপ্রায় খাল, বিল, পুকুর হইতে ডাঙ্গার দিকে ধাবিত হয়। তোমরা হয়ত অনেকে দেখিয়াছ, ইহার লেজ চুনুপুঁটী কিংবা রুই কাতলের মত দুই ভাগে বিভক্ত



কৈমাছ

নহে। ইহার শল্কগুলি শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত এবং তাহাদের উপরিভাগ পিচ্ছিল পদার্থে আবৃত থাকে। ইহাদের মুখ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ফুলকোর নিকট বায়ু সঞ্চয় করিয়া রাখার এক প্রকার পৃথক যন্ত্র আছে। ইহারই সাহায্যে তাহারা ডাঙ্গার উপরেও শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারে। ইহারা সাড়ে আট ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসই ইহাদের ডিম পাড়িবার সময়।

মাগুরমাছ বঙ্গদেশের প্রায় সকল যায়গাতেই পাওয়া যায়। ইহাও কৈমাছের মত জল ছাড়া ডাঙ্গায় অনেকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে, সুতরাং জীবন্ত সংগ্রহ করার তেমন কোন অসুবিধা নাই। এই মাছ পুষ্টিকব খাদ্য বলিয়া রোগীর পথ্যরূপে খুব বেশী ব্যবহৃত হয়।

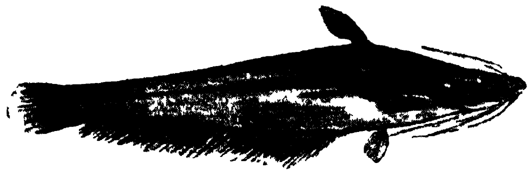
মাগুর একটি শল্কহীন মাছ। কৈমাছের মত ইহার উপর ও নীচের দিকের পাখ্না দুইটি বেশ বড়। তাহারা কৈমাছের মত তেমন দৃঢ় নহে,



মাগুরমাছ

বরং অপেক্ষাকৃত কোমল। পাখ্নাগুলির কিনারা সাধারণতঃ লাল বর্ণের থাকে। লেজের অগ্রভাগস্থিত পাখ্নাটি কৈমাছেরই মত কতকটা গোলাকার; চামড়ার রং কটা এবং স্পর্শ করিলে অত্যন্ত পিচ্ছল বোধ হয়। এই মাছ প্রায় একহাত লম্বা হইতে দেখা যায়। মাথা চেপ্টা এবং পাতলা চর্ম্মে আবৃত থাকে। চক্ষু গোলাকার। নাকের ছিদ্র পরস্পর দূরে অবস্থিত এবং তাহাদের নিকট লম্বা লম্বা শুঁড় আছে। মুখ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। কৈমাছের মত ইহাদেরও বায়ু সঞ্চয় করিবার পৃথক্ যন্ত্র আছে এবং ইহার সাহায্যে তাহারা ডাঙ্গায় চলাফেরা করিতে পারে।

শিঙ্গীমাছও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেও জীবন্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার কান্‌কোর নিকট যে দুইটি পাখ্‌না থাকে, তাহাতে সূচল ও সবল দুইটি কাঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাঁটা দুইটির আঘাত ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া, অনেকেই ইহাকে জ্যান্ত অবস্থায় ধবিতে সাহস কবে না। ইহাব মাংস খুব পুষ্টিকর। এঁধো পুকুবে পাঁকেব মধ্যে ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। ইহাবা প্রায় এক ফুট লম্বা হয়। ইহাদের পেটের নিম্নস্থ পাখ্‌না, কৈ এবং মাগুবেব মত বড়, কিন্তু শিবদাঁড়ার উপবকার পাখ্‌নাটি নিতান্ত ছোট। ইহাবা মাগুরমাছের মতই শল্কহীন এবং পিচ্ছিল। বং মাগুরের চাইতে

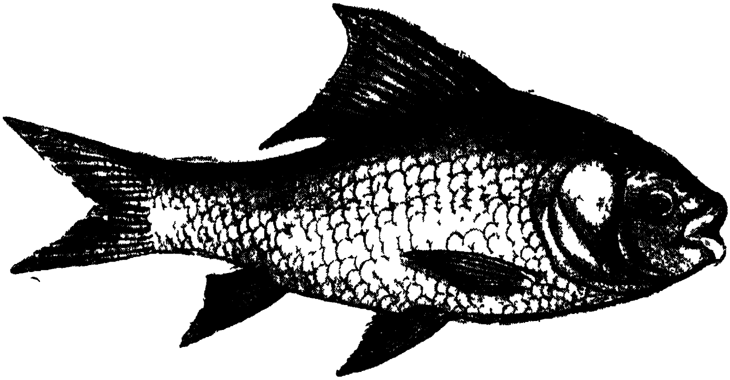


শিঙ্গীমাছ

কিঞ্চিৎ কাল। বাচ্চাগুলি অপেক্ষাকৃত লাল বর্ণের থাকে। মাথা চাপা, এবং পাতলা চর্ম্মদ্বারা আবৃত থাকে। কিন্তু মাগুরমাছের মত তত বিস্তৃত নহে। মাগুরমাছের মত ইহাদেরও শুঁড় আছে। ইহাদের ডিমের রং অপেক্ষাকৃত সবুজ। ইহারাও ডাঙ্গায় চলাফেরা করিতে পারে। এজন্য ইহাদের শিরদাঁড়ার দুইধারে বায়ু সঞ্চয়েব দুইটি সুদীর্ঘ থলে আছে। একটি মাছের ঘাড় কাটিয়া পরীক্ষা করিলেই তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে।

কাতলমাছ আকারে মস্ত বড় হইতে দেখা যায়। ইহারা পরিষ্কার অথবা লোনা যে কোন প্রকার জলে বাস করিতে পারে। মাথা খুব বিস্তৃত ; উপর দিকে ঠোঁট না থাকিলেও নীচের ঠোঁট বেশ বড়। ইহাদের শুঁড় থাকে না, চক্ষু বড় এবং গোলাকার। চর্ম্ম শল্কযুক্ত। শল্কের আকার মাঝাবি রকমেব, খুব বড়ও নয় নেহাৎ ছোটও নয়। গায়ের রং পিঠের দিকে ধসর এবং পেটের দিকে সাদা। পাখ্‌নাগুলির রং সাদায় কালয় মিশান

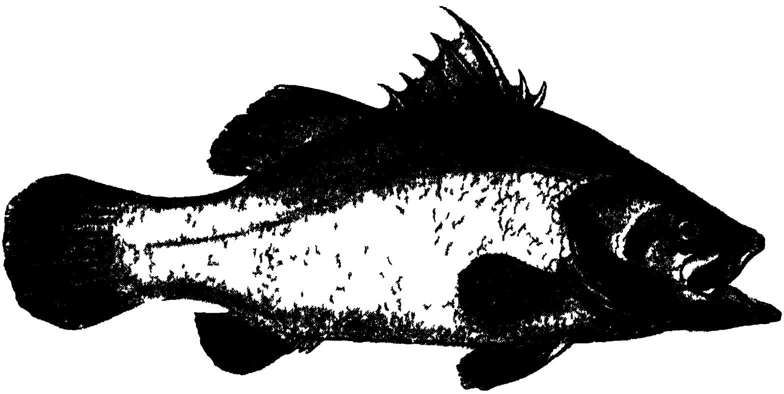
থাকে, কোন কোন মাছে একদম কালই দেখা যায়। এই মাছের ছোট ছোট বাচ্চা পুকুবে ছাড়িয়া দিলে, অল্প সময়েব মধ্যেই বেশ বড় হইয়া পড়ে। এই মাছ খুব সবল হয়। জাল দিয়া আটকাইবাব সময ইহাবা এরূপ সজোরে



কাতলমাছ

লাফ দেয় যে, অনেক সময় ইহাদিগকে জালে বদ্ধ কবিয়া বাখা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

ভেট্‌কীমাছও একটি বৃহৎ শ্রেণীব মাছ। লোনা এবং পরিষ্কার উভয়

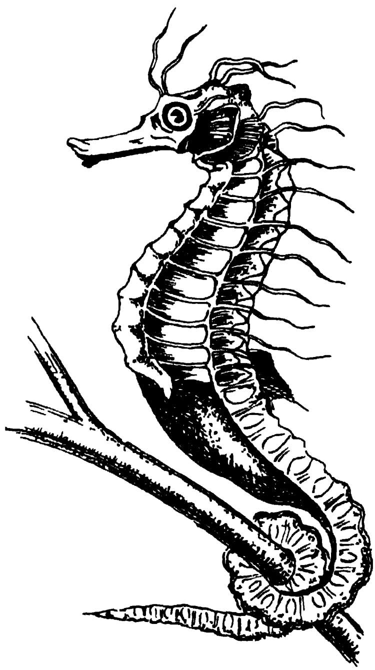


ভেট্‌কীমাছ

প্রকার জলেই ইহারা বাস করিয়া থাকে। বড় বড় নদীর ধারে যে মাছগুলি ধরা পড়ে, তাহা খাইতে সুস্বাদু। ইহারা ওজনে এক একটি

দুইমণ, আড়াই মণ পর্য্যন্ত ভারী হইতে শুনা যায়। ইহাদের দেহ বিস্তৃত এবং চেপ্টা। শল্কগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। মুখ খুব বিস্তৃত, জিব মসৃণ। পিঠের দিকের পাখ্‌না খুবই সবল। ইহার তৃতীয় কাঁটাটি সব চাইতে লম্বা এবং মোটা। কান্‌কোর কাছের পাখ্‌না দুইটি অন্য দুইটির চাইতে কিঞ্চিৎ ছোট এবং গোলাকার। পিঠের রং সবুজ মিশ্রিত ধূসর, পেট এবং অন্যান্য অংশের রং রূপালি সাদা।

সাগরাশ্ব (Hippocampus, Sea-horse)


সাগরাশ্ব

ইহারা সমুদ্রের লোনা জলে জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মুখ দেখিতে কতকটা অশ্বের মত, তাই ইহার এই নাম। বাস্তবিক পক্ষে ইহা এই শ্রেণীর সমুদ্রজাত একটি ছোট মাছ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার লেজ, এই শ্রেণীর পূর্ব্বোক্ত মাছগুলি হইতে শুধু দেখিতেই যে ভিন্ন রকমের তাহা নহে, এই মাছ তাহার লেজের সাহায্যে কোন কিছু জড়াইয়া ধরিতে পারে। এই শ্রেণীর অন্যান্য মাছ তাহাদের লেজ এরূপভাবে কখনও ব্যবহার করিতে পারে না। জলের তলায় ঐ দেখ, একটি সাগরাশ্ব কেমনভাবে লেজের সাহায্যে একটি আশ্রয় জড়াইয়া বসিয়া আছে।

ভীষণ দর্শন মাছ (Elasmobranch Type)

এই শ্রেণীর মাছ শুধু সমুদ্র জলেই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। হাঙ্গর জাতীয় মাছ আকারে খুব লম্বা হয়। ইহাদের পিঠের উপরকার

পাখ্না সাধারণতঃ বড় হইয়া থাকে। ইহাদের লেজের আকার বিসদৃশ অর্থাৎ রুই কিংবা কাতল মাছের লেজের মত নীচে এবং উপরে সম আকারের হয় না। মুখ দেহের নীচের দিকে থাকে। ফুল্‌কোগুলি কান্‌কো



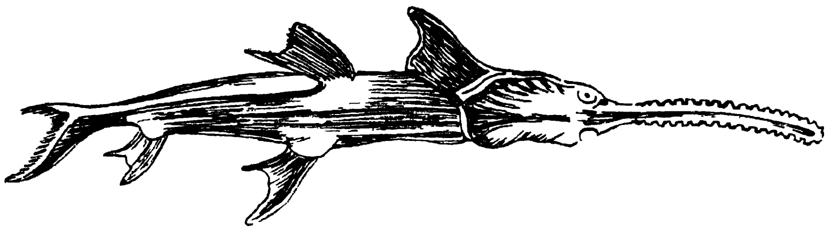
উপরে হাতুড়িমুখ হাঙ্গর, নীচে বড় সাধারণ হাঙ্গর

দ্বারা, সৌম্যদর্শন মাছের মত আবৃত থাকে না। বাহিরের দিকে ফুল্‌কোগুলির ফাঁক, পৃথকভাবে উন্মুক্ত থাকে।

হাঙ্গর বড় ভয়ানক জীব। সমুদ্রের জলে, উপরে নীচে, সকল যায়গাতেই ইহারা বিচরণ করে। এমন কি কখনও কখনও সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীর জলেও দেখা দিয়া থাকে। ইহাদের মুখে দুই পাটী ভীষণ রকমের দাঁত আছে। ইহার সাহায্যে তাহারা একজন মানুষকে অনায়াসে দুই টুক্‌রা করিয়া ফেলিতে পারে। জাহাজ ডুবিয়া গেলে সমুদ্রজলে নাবিকগণ

হাঙ্গরকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিয়া থাকে। গবম দেশেব সমুদ্র জলেই হাঙ্গরেব উৎপাত বেশী। ইহাদেব দাঁতেব পাটী তিমি মাছেব দাঁতেব পাটীব মত ভয়ানক শক্ত। বহুদিন পবেও নষ্ট হয় না। মৃত হাঙ্গবেব বহু পুবাতন দন্তপাটী সমুদ্রেব তলা অনুসন্ধানকালে পাওয়া যায়।

হাঙ্গর আবাব নানা আকাবেব হইয়া থাকে। ডগ্‌ফিশ্ (Dogfish) নামক এক প্রকাব মাছ, তাহাও এই হাঙ্গব জাতীয় প্রাণী। আকাবে ছোট হইলেও ইহাবা হাঙ্গবেব মতই হিংস্র। হাতুড়িব মত মুখবিশিষ্ট একপ্রকাব হাঙ্গর আছে তাহাদেব দেহেব অগ্রভাগেব গঠন হাতুড়িব মত। ইহার দুই দিকের মাথায় দুইটি চক্ষু থাকে। ইহাবা প্রায় ষাট্ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া



কবাত মাছ

থাকে। ত্রিবাঙ্কোর উপকূলে ইহাদিগকে বহু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা তেমন হিংস্র নহে। করাত মাছ এই শ্রেণীর আর একটি উদাহরণ। করাত মাছেব দাঁত তাহার মুখের ভিতব না থাকিয়া সুদীর্ঘ এবং অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত নাকের দুই ধারে, সারিবদ্ধ-রূপে সজ্জিত থাকে। এই জাতীয় কোন কোন মাছ যেমন স্কেইট (Skate) প্রভৃতি, ইহাদের বৈদ্যুতিক আলোক উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে শরীবে বিদ্যুতের আঘাত পরিষ্কার-রূপে উপলব্ধি হয়। জীবজগতে এরূপ আশ্চর্য্যজনক জীবের অন্ত নাই।



স্কেইটমাছ

ইহাদেরই জ্ঞাতি ভাই তীব্রঘাতী (sting ray) নামক মাছের লেজে করাতের মত দাঁতবিশিষ্ট দুইটি কাঁটা আছে। তাহা দ্বারা ইহারা প্রাণীদেহে ভয়ানক বিষাক্ত ক্ষত উৎপাদন কবিতে পারে। ইহাদের আকার চেপ্টা এবং বিস্তৃত। ইহারা হাঙ্গবের মত আকারে লম্বা হয় না। এই জাতীয় কোন কোন মাছের লেজ আবার বেশ লম্বা হইয়া থাকে।

হাঙ্গর সাধারণতঃ ডিম পাড়িয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন হাঙ্গর আবার বাচ্চাও প্রসব করে।

তৃতীয় অধ্যায়

উভচর প্রাণী

(Amphibia)

তোমাদের পরিচিত ছোট বড় সকল রকমের ব্যাঙ্ এই উভচর প্রাণীর উদাহরণ। এছাড়া আরও কতকগুলি প্রাণী আছে যাহারা এই শ্রেণীরই অন্তর্গত কিন্তু তাহারা মোটেই তোমাদের পরিচিত নয়। যেমন তৃণ-গোধা (Newt), একপ্রকার গিরগিটি (Salamenders), আপুডা (Apoda) প্রভৃতি। ইহাদিগকে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে, যথা (১) লাঙ্গুলহীন (Anura), উদাহরণ নানারকমের ব্যাঙ্; (২) সলাঙ্গুল (Urodela), উদাহরণ তৃণগোধা (Newt) প্রভৃতি; (৩) সর্পাকৃতি অর্থাৎ হস্তপদাদি অঙ্গহীন (Apoda)।

উভচর এই নাম হইতেই, এই শ্রেণীর প্রাণী যে জলে স্থলে সমানভাবে বিচরণ করে তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। প্রথম অবস্থায় ইহারা সকলেই জলে বাস করে। এমন কি ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রাণী পূর্ণবয়স্ক হইলে পরও, জল হইতে ডাঙ্গার দিকে বেশী দূরে যায় না। কচি সময় জলের ভিতর শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য ইহাদের মাছের মত ফুলকো থাকে। তারপর যখন বড় হয় তখন তাহাদের ফুস্‌ফুস্ গঠিত হয়। এই সময় তাহারা ডাঙ্গায় চড়িয়া বেড়াইতে পারে। নীচশ্রেণীর যে সকল প্রাণীর কথা এপর্য্যন্ত বলা হইয়াছে তাহাদের কাহারই কণ্ঠস্বর নাই। ইতর শ্রেণীর প্রাণীদিগের মধ্যে, কণ্ঠস্বর এই উভচর প্রাণীরই প্রথম শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের দেহ কোমল চর্ম্ম ছাড়া সাধারণতঃ আর কোন আবরণে আবৃত থাকে না। চামের উপর আঁঠাল তরল পদার্থে ঢাকা থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের রক্ত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। সকল রকম উভচরেই জলে কিংবা

জলের ধারে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ডিমের ভিতর হইতে যে ছানা বাহির হয় তাহার সঙ্গে পিতামাতার কোন সাদৃশ্য থাকে না। পরে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া পিতা মাতার আকার প্রাপ্ত হয়। ব্যাঙের জীবনী আলোচনা করিবার সময়ে তোমরা তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারিবে। ব্যাঙ্ সহজলভ্য এবং তাহার জীবনীও বড় রহস্যপূর্ণ সেজন্য তাহাই প্রথম বলা হইল।

লাঙ্গুলহীন

(Anura)

ব্যাঙ্

আমাদের দেশে নানা রঙের ও নানা আকারের ব্যাঙ্ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কোলা ব্যাঙ্ ও কট্কটে ব্যাঙ্ তোমরা প্রায় সকলেই দেখিয়াছ। কোলা ব্যাঙ্ সাধারণতঃ নদী, নালা, পুকুর ও অন্যান্য জলা যায়গার ধারে গর্ত্তের মধ্যে বাস করে। তাহারা জলেই থাকিতে ভালবাসে।



কোলা ব্যাঙ্ ও কট্কটে ব্যাঙ্

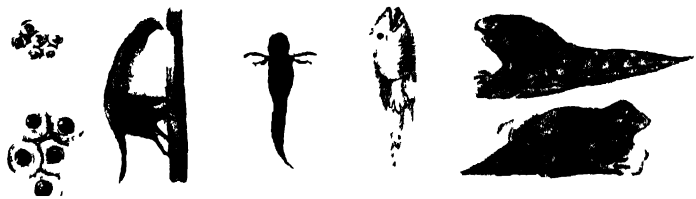
বর্ষার নূতন জলে ইহারা যে কেমন মনের আনন্দে গান করিতে থাকে তাহা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার কোন অসুবিধা না হয় তাহার জন্য, জলে থাকা কালে, তাহারা তাহাদের মুখ জলের উপর

একটু ভাসাইয়া রাখে। কট্‌কটে ব্যাঙ্‌ আমাদের ঘরের কোণে কিংবা এইরূপ কোন অন্ধকার যায়গায় ও গর্ত্তে লুকাইয়া থাকে। জলে তাহারা খুব কম সময়েই বাস করিতে দেখা যায়।

কট্‌কটে ব্যাঙ্‌ ও কোলা ব্যাঙ্‌ যদিও দেখিতে প্রায় একই রকম তথাপি ইহাদের মধ্যে বেশ তফাৎ আছে। কোলা ব্যাঙ্‌ বেশ সভ্যভব্য। ইহাদের শরীরের ত্বক্‌ মসৃণ ও চক্‌চকে। আকারেও বেশ বড় হইয়া থাকে। কট্‌কটে ব্যাঙ্‌ বড় কদাকার। ইহাদের শরীরের ছোট বড় গোটা গোটা মাসকলায়ের মত গণ্ডমালা থাকাতে বড়ই বিশ্রী দেখায়। এই গণ্ডমালার ভিতরে বিষাক্ত রস সঞ্চিত থাকে। এই দুই রকম ব্যাঙেরই যে চারিটি পা আছে, তাহা বোধ হয় তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। ইহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে কোলা ব্যাঙের পিছন দিকের পা যেমন লম্বা তাহার অনুপাতে কট্‌কটে ব্যাঙের পিছন দিকের পা অনেকটা খাট। কোলা ব্যাঙের সম্মুখের পা দুইটিতে চারিটি অঙ্গুলী থাকিলেও পিছন দিকের পায়ের অঙ্গুলী কিন্তু পাঁচটি, এবং হাঁসের পায়ের পাতার মত পরস্পর সংযুক্ত। জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইবার সময় তাহারা তাহাদের এরূপ পায়ের দ্বারা নৌকার দাঁড়ের মত জল টানিতে থাকে। এইরূপে সাঁতার কাটিবার সময় সম্মুখে যাহা পড়ে সাম্‌নের পা দুইটিতে তাহা সরাইয়া দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া নেয়। কোলা ব্যাঙের মুখে বেশ সূচল দাঁত আছে। তাহাদের জিব্‌ চট্‌চটে এবং উল্টাভাবে মুখের সম্মুখের দিকে সংলগ্ন। ইহার সাহায্যেই তাহারা পোকা-মাকড় প্রভৃতি শিকার ধরিয়া খায়। কোলা ব্যাঙের চোখের নীচের দিকের পাতা স্বচ্ছ, সুতরাং চোখ বন্ধ থাকিলেও তাহারা দেখিতে পায়। তাহাদের বুকের রং সম্পূর্ণ ফিকে সবুজ। পিঠের দিকে শিরদাঁড়ার উপর যে উজ্জ্বল সোণালী একটি রেখা আছে তাহা প্রথমেই তোমাদের চোখে পড়িবে। কোলা ব্যাঙের শরীর পিচ্ছিল পদার্থে সম্পূর্ণ আবৃত বলিয়া সাপ কিংবা মাছ সহসা ইহাদিগকে ধরিতে পারে না। কট্‌কটে ব্যাঙের

শরীরে এরূপ পিচ্ছিল পদার্থ না থাকাতে, একবার ধরা পড়িলে আর তাহাদের পলাইবার উপায় নাই। সেজন্য সাপ, মাছ প্রভৃতিতে কট্‌কটে ব্যাঙই বেশীর ভাগ খাইয়া থাকে।

মাদী কোলা ব্যাঙ্‌, জলা যায়গার ধারে জলের মধ্যেই ডিম পাড়ে। এই ডিমগুলির সকল দিক আঠাল পিচ্ছল পদার্থে আবৃত থাকাতে একত্র জমা হইয়া থাকে, দূর হইতে দেখিলে অনেকটা ভাতের ফেন কিংবা জলের ফেনার মত দেখায়। ডিমের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ, তিনটি আঠাল পিচ্ছল আবরণে একটির পর আর একটি, এইরূপ ভাবে আবৃত থাকে। ব্যাঙের ডিম হইতে যে ছানা বাহির হয় তাহাকে ব্যাঙাচি কহে। কোলা ব্যাঙের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই, বরং মাছের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ব্যাঙাচিগুলি কিরূপ ভাবে, ক্রমশঃ ব্যাঙের আকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা যদি দেখিতে চাও, তবে জলাশয়ের ধারে ঘাসের মধ্যে যেখানে ব্যাঙাচিগুলি জমা হইয়া খেলা করিতে থাকে, সেখানে বিশেষ মনোযোগের



ডিম ব্যাঙাচি হইতে ব্যাঙের উৎপত্তি

সহিত কিছুদিন লক্ষ্য করিও। ছবিতে যেমন ব্যাঙাচির বিভিন্ন আকার দেওয়া হইয়াছে, ক্রমশঃ এইরূপ সকল আকারের ব্যাঙাচিই দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ ব্যাঙাচির কেবল মাথা ও লেজ থাকে। তারপর তাহার দুইধারে সূতার মত ফুল্‌কো দেখা দেয়। ইতিমধ্যে লেজের ঠিক উপরেই পিছন দিকের পা দুইটিও ক্রমশঃ বাহির হয়। তারপর ফুল্‌কো দুইটি ঠিক নীচে সম্মুখের পা দুইটি গজাইয়া উঠিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুল্‌কো দুইটিও ক্রমশঃ ছোট হইয়া একেবারে লোপ হইয়া যায়। প্রথমতঃ

নাক, মুখ, চোখ, দাঁত কিংবা পাকস্থলী প্রভৃতি ইহাদের কিছুই থাকে না। তারপর এদিকে যেমন বাহিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ গঠিত হইতে থাকে, তেমনি ভিতরের দিকে দাঁত, মুখ, পাকস্থলী প্রভৃতিরও সৃষ্টি হয়। ব্যাঙাচি যে ঘাসের সহিত সংলগ্ন থাকে তাহা হইতেই তাহারা তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহারা ঘাস খায় বলিয়া পাকস্থলীও বেশ বড় হয়। একটি ব্যাঙাচি হাতের উপর পালটিয়া ধরিলেই ইহার পাকস্থলী তোমাদের চক্ষে পরিবে। ইহা দেখিতে স্প্রিং এর মত পাকান। ব্যাঙাচি তাহাদের খাদ্যের কতক অংশ তাহাদেব লেজ হইতেও শোষণ করিয়া থাকে। এই জন্যই ব্যাঙাচির লেজটি ক্রমশঃ ছোট হইয়া যায়। তারপর লেজের এই বাকী অংশটুকু পড়িয়া গেলে, পূর্ণাঙ্গ কোলা ব্যাঙের উৎপত্তি হয়। তখন ডাঙ্গায় ও জলে তাহারা অবাধে বিচরণ করিতে থাকে। ব্যাঙাচিব অবস্থান ও আকারের এরূপ ক্রম পরিবর্ত্তনেব বিষয় চিন্তা করিয়া, পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে মাছ হইতেই কাল ক্রমে ব্যাঙেব উৎপত্তি হইয়াছে।

সলাঙ্গুল

(Urodela)

তৃণ-গোধা (Newt)

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ সমতল ভূমিতে এই শ্রেণীর প্রাণী বড় দেখিতে



পুং তৃণ-গোধা

পাওয়া যায় না। হিমালয় প্রান্তে দারজিলিংএ একপ্রকার সলাঙ্গুল তৃণ

গোধা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে ভারতের ন্যায় গরম দেশ তাহাদের প্রকৃত আবাস স্থল নয়। শীত প্রধান যায়গাই তাহাদের বাসের প্রকৃষ্ট স্থান। বয়স্ক তৃণ-গোধার ব্যাঙের মত চারিটি পা থাকে।

ব্যাঙের মত তৃণ-গোধার জন্ম বৃত্তান্তও বড় আমোদজনক। ইহারাও ব্যাঙের মত ডিম্ব প্রসব করে এবং ডিম হইতে ব্যাঙাচির মত বাচ্চা হইয়া থাকে। তাহাদের রং ব্যাঙাচির চাইতে কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে। ব্যাঙের সঙ্গে যে সকল বিষয়ে ইহাদের তফাৎ রহিয়াছে তাহাই এখন বলা হইতেছে। ইহাদের ডিমের রং হলদে এবং তাহা চারিদিক পিচ্ছল পদার্থে আবৃত থাকে। ব্যাঙের মত ইহাদের ডিম এক স্থানে জড় হইয়া থাকে না। জলজ উদ্ভিদের পাতার উপর স্থানে স্থানে, ইহারা এক একটি ডিম পারিয়া রাখে। ডিম হইতে ব্যাঙাচির মত যে বাচ্চা হয় তাহা ব্যাঙাচির চাইতে আকারে লম্বা হইয়া থাকে। ইহাদের ফুল্‌কো ব্যাঙাচির চাইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, এমন কি হাত পা গজাইবার পরও দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মুখের পা পিছনের পায়ের পূর্ব্বেই গজাইয়া উঠে। ইহারা বড় হইলেও আর লেজটি খসিয়া পরে না। বড় তৃণ গোধার লেজ তাহার জলে চলা ফেরার সাহায্যকারী একটি অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।



তৃণগোধার ছানা

হস্তপদাদি অঙ্গহীন উভচর (Apoda)

ইহাদের সংখ্যা খুবই কম। ইস্‌থিওপ্‌সিস (Ichthyophis) নামক এই শ্রেণীর প্রাণী দক্ষিণ ভারত ও সিংহল দ্বীপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকার সাপের মত লম্বা এবং চামের উপর ছোট ছোট দানা



এ পাট

থাকে। চোখ চামের দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া ইহারা দেখিতে পায় না। সাধারণতঃ মাটির নীচে পাঁকের মধ্যে বাস করে বলিয়াই ইহাদের চোখের তেমন আবশ্যকও নাই। ইহারা বড় বড় ডিম পাড়ে এবং মাদী ইসথিওপ্‌সিস্ ডিমগুলিকে জড়াইয়া বসিয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়।

সরীসৃপ

যে সকল প্রাণী বুকে ভর দিয়া চলাফেরা করে, সাধারণতঃ তাহাদিগকেই আমরা সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণী বলিয়া থাকি। টিক্‌টিকি, গিরগিটি, অঞ্জিন, সাপ, গোসাপ, তক্ষক, কুম্ভীর, কচ্ছপ, কাছিম প্রভৃতি প্রাণী এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। সরীসৃপের নামেই অনেকের ঘৃণার উদ্রেক হয়। বাস্তবিক কিন্তু তাহারা তত ঘৃণার পাত্র নয়। একেত বৈজ্ঞানিকদিগের মতে তাহারা মানুষের চাইতে পৃথিবীর প্রাচীনতর অধিবাসী, তাছাড়া কচ্ছপ, কাছিম প্রভৃতি কোন কোন জাতীর প্রিয় খাদ্য, সুতরাং তাহাদিগকে কখনই এরূপ ঘৃণাকরা উচিত নহে। প্রাচীনকালে বহু অতিকায় সরীসৃপ ছিল, তাহাদের কঙ্কাল এখনও বিভিন্ন যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে। বর্ত্তমানে সেই শ্রেণীর অতিকায় জীবন্ত সরীসৃপ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবীতে মাছের পরেই ইহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল।

সরীসৃপের দেহ শল্কেরদ্বারা অথবা অন্যকোন কঠিনতর আবরণে আবৃত থাকে। ইহাদের রক্ত গরম না হইয়া অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা এবং হৃদয় তিনটি কুঠরী বিশিষ্ট। ইহারা ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে। ইহাদের কখনও ফুল্‌কো থাকে না। সাধারণতঃ পাখীর মত, ডিম হইতেই ইহাদের বাচ্চা হয়। বাচ্চার আকার লক্ষ্য করিয়া দেখিও, প্রথম হইতেই ইহারা মাতাপিতার মত থাকে। দুইটি আবরণের দ্বারা আবৃত ভ্রূণ এই শ্রেণীর প্রাণীদিগের মধ্যেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। সরীসৃপের মধ্যে সাপ ভয়ানক বিষাক্ত, সুতরাং সাপের পরীক্ষা কালে, সকলেরই খুব সাবধান হওয়া উচিত। তা'না হইলে বিপদ ঘটিতে পারে। আমাদের দেশে আর

কোন সরীসৃপই এরূপ বিষাক্ত নহে। এমন কি তক্ষক, যাহাকে অনেকে বিষাক্ত বলিয়া ভয় করে, তাহারও কোন বিষ নাই।

সকল রকমের সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদিগকে দেহ গঠনেব তারতম্য অনুসারে আবাব পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা হইয়াছে। যেমন (১) টিক্‌টিকি জাতি, (২) কুম্ভীব জাতি (৩) কচ্ছপ জাতি, (৪) সর্পজাতি, ও (৫) টিউটেবা জাতি।

টিক্‌টিকি জাতি (Lacertilia)

টিক্‌টিকি জাতীয় প্রাণীদিগের দেহ শল্কেরদ্বাবা আবৃত থাকে। তাহাদেব হাত পা, অর্থাৎ চাবিটি প্রত্যঙ্গ বেশ সুগঠিত। এই প্রত্যেক প্রত্যঙ্গেই পাঁচটি করিয়া নখ সংযুক্ত অঙ্গুলী থাকে। তাহাবা তাহাদেব অক্ষীগোলক অনায়াসে নাড়াচাড়া কবিতে পাবে। তাহাদেব দাঁত চোয়ালের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযুক্ত। কোন কাবণে তাহাদেব লেজেব কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, তাহা পুনরায় গঠিত হয়। কোন কোন সময় লেজেব দুইটি আগাও গঠিত হইতে দেখা যায়। তাহাবা প্রায় সকলেই ডাঙ্গায় বাস কবে এবং পোকা মাকড়ই তাহাদেব প্রধান খাদ্য।

সবীসৃপের মধ্যে টিক্‌টিকি সকলেবই পবিচিত। তাহারা তোমাদেব সকলের বাড়ীতেই পাকা, কাঁচা, যে কোন বকম ঘবে বাস কবিয়া থাকে। এই টিক্‌টিকি আবার অনেক রকমেব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের টিক্ টিক্ শব্দ ঘরের যে কোন যায়গা হইতে শুনা গিয়া থাকে। ঘরেব দেওয়াল কিংবা ছাদের যে কোন স্থান দিয়া তাহারা দ্রুত গতিতে আবলীলাক্রমে গমনাগমন কবিতে পারে। পায়ের পাতার নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদির মত শল্ক আছে, তাহারই সাহায্যে তাহারা দেওয়াল কিংবা ঘরের ভিতরদিকের ছাদের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ রাত্রি বেলাই বাহির হয়, এবং যে সকল পোকা আলোর চারিদিকে জমা হয়, তাহাদিগকে ধরিয়া খায়। তাহাদের

লাঙ্গল যেমন অতি সহজেই দ্বিখণ্ড হইযা যায, তেমনি আবাব শীঘ্রই নূতন লাঙ্গল গজাইযা উঠে। গিবগিটিও এই শ্রেণীব সবীসৃপ। তাহাবা গাছেব উপবে বাস কবে। বাস্তাব ধাবে, অনেক সময ঝোপেব ভিতবেও তাহাদিগকে দেখিতে পাওযা যায। জিব আটা-সংযুক্ত বলিযা অতি সহজেই তাহাবা পোকা ইত্যাদি বন্দী কবিযা খাইতে পাবে। তোমাদেব পবিচিত অজ্গিনও এই শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত।



উপবে গিবগিটি নিচে টিক্‌টিকি

টিক্‌টিকি জাতীয সবীসৃপেব মধ্যে বহুরূপী নামক প্রাণীব দেহেব বং পবিবর্ত্তনেব ক্ষমতা বডই সুন্দব এবং আশ্চর্য্যজনক। হযত তোমবা অনেকেই এই বহুরূপীকে দেখিযাছ। তাহাব চামেব ভিতব নানা বংএব বড বড কণা আছে। এইগুলি স্নাযুমণ্ডলীব সাহায্যে তাহাবা নাডাচাডা করিযা ইচ্ছামত রংএব পবিবর্ত্তন কবে। এইরূপে চারিদিকেব লতাপাতার রংএর সহিত বং মিশাইয়া যখন বসিযা থাকে, তখন সহসা তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা

রক্ত শোষণ করে বলিয়া অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে। লাল, সবুজ, ইত্যাদি রংএর পরিবর্ত্তন জন্যই হয়ত এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে, বাস্তবিক কিন্তু ইহারা মানুষের কোন অনিষ্ট করে না। এই জাতীয় একটি মাত্র প্রাণীর দাঁতে বিষ আছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইয়াছে, এ ছাড়া আর সকলেই নির্ব্বিষ।

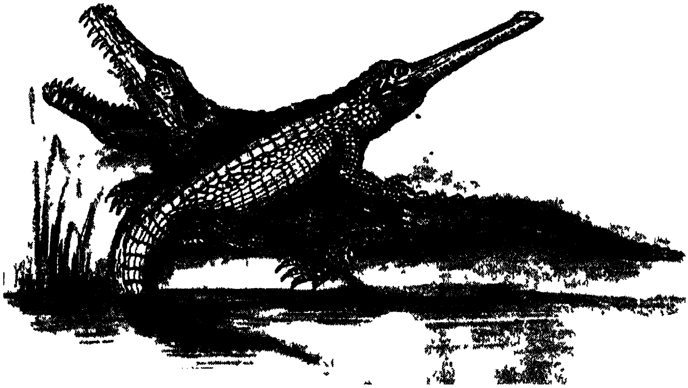
তোমরা সকলেই জান যে টিক্‌টিকি জাতীয় কোন প্রাণীই উড়িতে পারে না। বাস্তবিক কিন্তু এক জাতীয় টিক্‌টিকি আছে, তাহারা তাহাদেব চর্ম্ম নির্ম্মিত পাখার সাহায্যে উড়িতে পাবে। ইহাদিগকে খেচব টিক্‌টিকি (flying Lizard) বলিয়া থাকে।

২। কুম্ভীর জাতী (Crocodilia)

এই জাতীয় প্রাণীরই দেহের আকার বড় হইলেও গঠন অনেকটা টিক্‌টিকিরই অনুরূপ। ইহাদের মোটা চাম উপরদিকে যেমন আঁইস সংযুক্ত নীচেও আবার তেমনি আঁইস থাকে। অবশ্য নীচের দিকের আঁইসগুলি অস্থি নির্ম্মিত হওয়াতে বেশ কঠিন। চোয়ালের উপরে যে শ্রেণীবদ্ধ গর্ত্ত থাকে তাহাতেই তাহাদের দাঁতগুলি সংলগ্ন থাকে। এই জাতীয় প্রাণীর লেজ একদিকে যেমন জলে সাঁতড়াইবার পক্ষে তাহাদিগকে সাহায্য করে, তেমনি আবার শত্রুকে আক্রমণ করিবার পক্ষেও মস্তবড় অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহের ভিতরে উদর ও বক্ষস্থলের মধ্যে একটি পাতল পর্দ্দা থাকে। তাহাদের উদর ও বক্ষস্থলের মধ্যেই প্রথম এই পর্দ্দা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের হৃদয় আবার চারি কুঠরী বিশিষ্ট। কানের মাত্র বাহ্যিক একটু চিহ্ন আছে। ইহারা সকলেই অণ্ডজ প্রাণী। জলের কাছে বালির ভিতর মাদী কুম্ভীর ডিম পারিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে সরীসৃপের মধ্যে কুম্ভীর আকারে যেরূপ বড় এবং বলিষ্ঠ হয়, তাহাতে তাহাকে সরীসৃপের মধ্যে রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহারা

ডিম হইতে বাহির হইবার পর বেশ সবল ও পুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত মাছ ধরিয়া খায়। তাহারা বড় হইলে নানা প্রকার প্রাণী, এমন কি মানুষ ধরিয়াও খাইয়া থাকে। তাহারা তাহাদের শিকার কামড়াইয়া ধরে এবং



কুম্ভীর

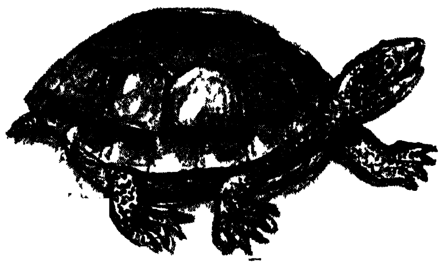
জলের মধ্যে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে। আমাদের মত তাহারাও শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে সুতরাং দীর্ঘকাল জলের নীচে থাকিলে, তাহারাও শ্বাস বন্ধ হইয়া মারা যাইতে পারে। এই জন্যই তাহারা ঘন ঘন জলের উপর ভাসিয়া উঠে। মরা জীবজন্তুর পচা মাংস খাইতেই তাহারা ভালবাসে। নদীতে যে সকল মৃতদেহ ভাসিয়া যায় তাহা যদি কুম্ভীরে খাইয়া না ফেলিত, তবে মানুষের যে কত ভীষণ অনিষ্ট হইত তাহা বলিয়া-শেষ করা যায় না। কুম্ভীরের যদিও শ্রেণীবদ্ধ বহু দাঁত আছে, তবুও তাহারা তাহাদের খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া খাইতে পারে না। দাঁতের দ্বারা ছিঁড়িয়া গিলিয়া খাইয়া ফেলে। তাহারা জীবজন্তু কোন শিকার ধরিলে প্রথমত: তাহাকে বধ করে, তাহার পর জলের ধারে ডাঙ্গার উপর গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পুঁতিয়া রাখে। পরে যখন তাহা পচিতে আরম্ভ হয়, তখন খাইতে আরম্ভ করে।

লম্বা ও সরু মুখবিশিষ্ট আর এক প্রকার কুম্ভীর আছে, তাহারা গঙ্গা,

সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীতে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা খুব সাঁতরাইতে পারে। মাছই ইহাদের প্রধান খাদ্য।

৩। কচ্ছপ জাতী (Chelonia)

সরীসৃপের মধ্যে কচ্ছপ বহুল পরিমাণে মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদেব দেহের সুদৃঢ় আবরণের জন্য, তাহাকে অতি সহজেই অন্যান্য সরীসৃপ হইতে পৃথকভাবে চিনিতে পারা যায়। তাহারা ইচ্ছামত, এই আবরণের ভিতর তাহাদের হাত, পা, মুখ ইত্যাদি অতি সহজেই গুটাইয়া রাখিতে পাবে।



কচ্ছপ

কচ্ছপ জল স্থল উভয় যায়গাতেই বাস করে। সমুদ্রের ধারে খুব বড় বড় কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। কঠিন ঠোঁটের সাহায্যে তাহারা ঘাস ইত্যাদি ছিঁড়িয়া খায়। জলে তাহাবা যত দ্রুত সাঁতাব কাটিতে পারে, ডাঙ্গায় কিন্তু তত তাড়াতাড়ি চলিতে পাবে না। এজন্য কোন লোক তাড়াতাড়ি চলিতে না পারিলে, লোকে তাহাকে কচ্ছপ বলিয়া ঠাট্টা করে। তাহারা ডাঙ্গায় গর্ত্ত করিয়া ডিম পারিয়া থাকে। তাহাদের দেহের বৃদ্ধি খুব ধীরে ধীরে হয় এবং তাহাদিগকে দীর্ঘকাল বাঁচিতে দেখা যায়।

৪। সর্প জাতী (Ophidia)

সরীসৃপের মধ্যে সর্পের পা নাই বলিয়া তাহাদিগকে অতি সহজেই অন্যান্য সরীসৃপ হইতে পৃথক করা যায়। ইহাই শুধু সর্পজাতীর একমাত্র পরিচয় নহে। কেননা উভচর এবং সরীসৃপের মধ্যেও পাহীন প্রাণী দেখিতে

পাওয়া যায়। সকল সাপেরই দেহ আঁস্ দ্বারা আবৃত থাকে। সকল সর্পই প্রতি বৎসর খোলস পবিত্যাগ করিয়া থাকে। • খাদ্য গিলিয়া খাইবার সময়, তাহারা মুখ খুব বিস্তৃত কবিতে পাবে। মুখের ভিতর চোয়ালেব মধ্যে, দাঁতগুলি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন এবং ভিতবের দিকে বাঁকান থাকাতে, শিকাব একবাব সর্পের মুখেব ভিতবে প্রবেশ করিলে, আর বাহির হইয়া আসিতে পারে না। তাহাদেব আর কোন অঙ্গ নাই বলিয়া একমাত্র মুখেব সাহায্যেই তাহাদিগকে শিকার ধবিতে হয়। সাপেব চোখে পাতা নাই। সে তাহার চোখ নাড়িতে চাড়িতে পাবে না। যদিও তাহাদের শুনিবার জন্য বাহ্যিক কোন অঙ্গ নাই তথাপি তাহাদিগকে কখনও বধির বলা চলে না। সাপের জিহ্বা লম্বা এবং দ্বিখণ্ডিত। ইহাদের মেরুদণ্ডের - এবং লেজেব হাড় পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ। সাপেব রং নানা রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সাপের রং খুবই জমকালো। ইহাতে অন্যান্য প্রাণী সহজেই তাহাদিগকে দেখিয়া সতর্ক হইতে পারে। ইহাদের লেজ কোন কারণে কাটিয়া গেলে টিকটিকি প্রভৃতির ন্যায় পুনরায় বর্দ্ধিত হয়।



গোক্ষুবে সাপ

আমাদের দেশে নানা প্রকার বিষাক্ত সর্প আছে। তাহাদের মধ্যে গোক্ষুরেই প্রধান। প্রতি বৎসর শত শত লোক শুধু সাপের কামড়ে মারা

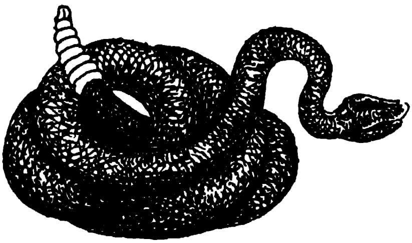
যায়। এ দেশে নির্ব্বিষ সাপের সংখ্যাও কম নহে। ঢোঁড়া, তুমুখী, মেটেবোড়া, নলডুগী, দাঁড়াশ প্রভৃতি সাপ তাহাদের উদাহরণ। সকল সাপকেই বিষাক্ত মনে করিয়া সাবধান হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। সাপ কোন অঙ্গে দংশন করিলে, তৎক্ষণাৎ খুব শক্ত দড়ি কিম্বা কাপড়ের পাড় দ্বারা, পরপর তুই তিন যায়গায় বাঁধিয়া রক্তের চলাচল একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিবে, এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিবে।

সাপের বিষদাঁতের ভিতর ছিদ্র থাকে এবং তাহারই নীচে বিষপূর্ণ একটি থলে আছে। সাপে দংশন করিলেই বিষের থলেতে চাপ পড়ে এবং বিষ, দাঁতের ছিদ্র পথে বাহির হইয়া, ক্ষতস্থানে রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। তাহাতেই লোকের মৃত্যু ঘটে। সাপুড়িয়ারা তাহাদের পোষা সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে বলিয়া, খেলা দেখাইবার সময়, সেই সকল সাপের দংশনে তাহাদের তেমন কোন অনিষ্ট হয় না। সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গেলেও পুনরায় তাহা গজাইয়া উঠে সুতরাং ইহা একবার ভাঙ্গিয়া দিলেও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। এজন্য সাপুড়িয়ারা কিছুদিন পরে পরেই সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকায় রেটল নামক ভয়ানক বিষাক্ত একটি সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ভাইপার জাতীয় সাপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহাদের মাথার উপর একটি গর্ত্ত থাকে। এসিয়া মহাদেশেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উত্তর আমেরিকাই তাহাদের আদৎ বাসস্থান। রেটল সাপ আবার নানা রকমের থাকে। ইহাদের চাইতে আকারে বহু বড় বড় সাপ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ইহারা যেরূপ ভয়ানক তেমন খুব কমই আছে। ইহারা সাধারণতঃ আট ফিটের বেশী লম্বা হয় না। ইহাদের একবার দংশনেই মানুষ একেবারে অসার হইয়া পরে। ব্যাঙ, ইঁত্বর, খরগোস, ছোট ছোট কুকুর প্রভৃতি প্রাণী ইহাদের প্রধান খাদ্য।

রেটল সাপের লেজ আবার অদ্ভুত রকমের। লেজের ডগাতে কতকগুলি অস্থিময় চক্র আলগাভাবে গাঁথা থাকে। ইহারা যখন চলিতে

থাকে তখন এই চাকাগুলির ঠুকাঠুকিতে খট্ খট্ শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ শুনিয়া অন্যান্য প্রাণী সতর্ক হইতে পাবে। একটি শেয়ালে শব্দ করিলে যেমন নিকটবর্ত্তী সকল শেয়ালই শব্দ কবিয়া উঠে, তেমনি একটি বেটল সাপ খট্‌খট্ শব্দ উৎপাদন কবিলে, নিকটবর্ত্তী সকল বেটলই খট্‌খট্ শব্দ কবিযা উঠে। তাহাদেব লেজেব শব্দ কবাতে তাহা-দেব যে কি সুবিধা তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। শীতকালে বহু বেটল সাপ একত্র জটলা হইযা ঘুমাইয়া থাকে



বেটল সাপ



অজগর সাপ এনাকোণ্ডা

আকারে অজগর সাপই সকলের চাইতে বড় অজগর নানা

রকমের। ইহারা সকলেই গরু, মহিষ, হরিণ প্রভৃতির মত বড় বড় প্রাণীকেও অনায়াসে গিলিয়া ফেলিতে পারে। অজগরের মধ্যে পাইথন ও এনাকোণ্ডা প্রভৃতি সাপই প্রধান। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত সাপ আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। তাহারা ক্ষুধার্ত্ত না হইলে মানুষকে কখনও আক্রমণ করে না। তাহারা চল্লিশ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। জলেই ইহারা বাস করে, ডাঙ্গায় তেমন দ্রুত চলাফেরা কবিতে পারে না। গাছের উপর তাহারা কিন্তু বিদ্যুৎ বেগে উঠিয়া পবে।

টিউটেরা জাতী (Rhyncocephalia)

ইহারা এক আশ্চর্য্য রকমের সরীসৃপ। ইহার ডাকনাম স্ফেনোডন (Sphenodon)। দেখিতে সাধাবণ টিক্‌টিকির মত হইলে পরেও তাহাদের গঠনে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। নিউজিলাণ্ডে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের লেজের আকার সাধারণতঃ দাঁড়ের মত হওয়াতে তাহারা এই লেজের সাহায্যে সম্পুর্ণ স্বাধীন ভাবে সাঁতার কাটিতে পারে। ইহারা মাংসাসী। মাছই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা মাটির ভিতরে গর্ত্তের মধ্যে বাস করে।

সাধারণ টিক্‌টিকি হইতে ইহাদের দেহগঠনের যে বিশেষ পার্থক্য আছে তাহা বাস্তবিকই একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী রাজ্যে বহু রকম পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল প্রাণী ছিল তাহাদের মধ্যে কোন কোন প্রাণীর অস্তিত্বই একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কাহারও কাহারও প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ভূগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া এখন বিভিন্ন দেশের যাদুঘরে রাখা হইয়াছে। তা ছাড়া যে সকল প্রাচীন প্রাণী এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যাহাদের বংশধর এখনও সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই, তাহাদের দেহের আকার সময়ের পরিবর্ত্তনে সবিশেষ

পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, ইহা একটু লক্ষ্য করিলেই বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। এবিষয়ের উদাহরণ পরে যখন আরও আলোচনা করা হইবে তখন তোমরা বেশ ভালমতই তাহা বুঝিতে পারিবে। অবশ্য কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহারা পৃথিবীর অতীব প্রাচীন অধিবাসী হইলেও তাহাদের দেহের আকারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই টিউটেরাই তাহার একটি উদাহরণ। প্রাচীন টিক্‌টিকি জাতীয় বহু প্রাণীর দেহেই বর্ত্তমানে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় কিন্তু সে এক অবস্থাতেই আছে।

জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ইহারই তিনটি চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা আমাদের দেবদেবীরই শুধু তিনটি চক্ষুর কথা শুনিয়াছ, কিন্তু কোন প্রাণীরও যে আবার তিনটি চক্ষু থাকিতে পারে তাহা বোধ হয় আর শুন নাই। গভীর জ্ঞানী পণ্ডিতেরা বহু প্রাণীর মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সকল প্রাণীরই মাথার ঠিক মধ্যভাগে আরেকটি চক্ষু ছিল। সেই চক্ষুর তেমন কোন প্রয়োজন না থাকাতে তাহা ক্রমশঃ লোপ হইয়া গিয়াছে। টিউটেরার মাথার উপর চামের নীচে এখনও আরেকটি চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। কচি অবস্থাতেই ইহা বেশী পরিষ্কার দেখায়। এই সকল কারণে মানুষেরও এইরূপ তিনটি চক্ষু ছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পাখীর কথা

(Aves)

তোমরা সকলেই নানা রকমের পাখী দেখিয়াছ, এবং এখনও দেখিতেছ। হয় ত পাখীর বিষয় তোমাদের অনেক কথাই জানা আছে। কিন্তু তা ছাড়াও পাখীর বিষয়ে বহুকথা শিখিবার আছে, যাহা তোমরা এখনও জানিতে পার নাই। পাখীর পালক, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাহাদের বাসা বাঁধিবার এবং ডিম পাড়িবার সময় ইত্যাদি কত বিষয়ই ত লক্ষ্য করিবার আছে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই এরোপ্লেন দেখিয়াছ। যাহারা এখনও ইহা দেখ নাই তাহারাও অন্ততঃ ইহার কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। পাখীগুলি আকাশে উড়িবার কালে, তাহাদের অঙ্গ সঞ্চালনপ্রণালী ও গঠনের বিষয় ক্রমাগত লক্ষ্য করিয়া, প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ বহু অধ্যবসায় সহকারে, পাখীরই দেহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ডাকবিভাগের সুবন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বে, বহু পোষা পায়রা ইহার মত দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিয়া, পত্রবাহকের কাজ করিত। পাখীর অঙ্গসঞ্চালন ও আকাশপথে ভ্রমণ-প্রণালী বিশেষরূপ লক্ষ্য করাতে, দেখ আজ একটা কিরূপ প্রয়োজনীয় জিনিষের সৃষ্টি হইয়াছে। বিচারবুদ্ধি সহকারে এরূপ দেখিবার প্রণালী শিখিতে পারিলে, তোমরা যাহা দেখিবে তাহারই দেখা, কোন না কোন সময় সার্থক হইবে। দুই চারিটি পাখী চিনিলে কিংবা তাহাদের খাদ্যাখাদ্যের বিষয় জানিলেই পাখীর কথা জানা হইল তোমরা একথা কখনও বলিতে পার না। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, তোমরা যাহা জান তার চাইতেও পাখীর বিষয়ে অনেক কিছুই লক্ষ্য করিবার আছে। তোমাদের নিতান্ত

পরিচিত কতকগুলি পাখীর উদাহরণ দ্বারা এখানে তাহারই আলোচনা করা হইবে। তোমরা তাহারই সাহায্যে বিশেষরূপ লক্ষ্য এবং পরীক্ষা করিয়া পাখীর বিষয়ে নানা কথা জানিবার ও শিখিবার চেষ্টা করিবে।

বঙ্গদেশে সচরাচর যে সকল পাখী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি তোমাদের খুবই পরিচিত; যথা,—কবুতর, ঘুঘু, মোরগ, হাঁস, রাজহাঁস, শকুনী, রাজশকুনী, গৃধিনী, চিল, চড়াই, কুররী, কোকিল, কাক, কাঠঠুকরা, খঞ্জন, বুলবুল, দোয়েল, শ্যামা, শালিক, টিয়া পেঁচক, ময়না ময়ূর, মাছরাঙ্গা, মুনিয়া, বাবুই, বক, বাজ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার প্রায় বারমাসেই তোমরা দেখিয়া থাক। আর কতকগুলি—যেমন কোকিল, খঞ্জন, মুনিয়া, বাবুই প্রভৃতি ইহারা শীতের শেষে অর্থাৎ বসন্তকালে, এ দেশে আসিয়া থাকে। তোমাদের বাড়ীতে কিংবা বাড়ীর আসেপাশে যে সকল পাখী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমতঃ তাহাদেরই আকার, গতিবিধি, এবং খাদ্যাখাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করিবে। তারপর অন্যান্য পাখীগুলিরও সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সম্ভব হইলে চিত্রসহ প্রকৃতির খাতাতে সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবে।

মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরেই পাখীর স্থান। পাখীমাত্রেরই শরীর পালক দ্বারা আবৃত থাকাতে স্তন্যপায়ী কিংবা সরীসৃপ বলিয়া কোন পাখীকেই তোমাদের ভুল করিবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে, তাহাদের যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণীর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, তেমনি আবার অন্য দিকে সরীসৃপ শ্রেণীর সঙ্গেও তাহাদের কিছু কিছু সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইবে, তাহা তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিও। ইহাদের দেহের সম্মুখ-ভাগের অঙ্গ দুইটি, *আকাশে উড়িবার জন্য পাখার আকার ধারণ করাতেই* ইহারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, আকাশে বিচরণ করিতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে, তোমাদের পরিচিত বাদুর এবং চামচিকার চর্ম্ম সংযুক্ত ডানা আছে বটে, কিন্তু তাহারা ইহাদের মত তত দ্রুতগতিতে উড়িতে পারে না।

ইহাদের পালক এবং পাখায় বিশেষত্বই ইহাদিগকে এ বিষয়ে সকল প্রাণীর চাইতে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন করিয়াছে। সরীসৃপের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখিতে পাইবে যে সরীসৃপের অঙ্গ যেরূপ শল্কের দ্বারা আবৃত, ইহাদের অঙ্গও সেইরূপ পালকের দ্বারা আবৃত। পাখীর পালক দেখিতে ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হইলেও, তাহারা একই শ্রেণীর আবরণ। তারপর সরীসৃপের ন্যায় পাখীও ডিম পাড়িয়া থাকে। সরীসৃপ যেমন প্রত্যেক বৎসরই শরীরের খোলস পরিত্যাগ করে, পাখীও তেমনি বৎসর বৎসর পুরাতন পালক বদলাইয়া থাকে। অবশ্য স্তন্যপায়ী প্রাণীরাও বৎসরে একবার রোম বদলাইয়া থাকে। কিন্তু পাখীর রক্ত ঠাণ্ডা না হইয়া স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত অপেক্ষাকৃত গরম। হৃদয়ের গঠন, তাহাদের মত চারি কুঠরী বিশিষ্ট এবং ফুস্‌ফুসের সাহায্যেই তাহারা শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে। সরীসৃপের ডিম হইতে যে বাচ্চা বাহির হয়, তাহা প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ পিতামাতার ন্যায় আকার বিশিষ্ট হয়, কেবলমাত্র আকারে নিতান্ত ছোট দেখায়। পাখীর ডিম হইতে যে শাবক বাহির হয়, তাহার সঙ্গে তাহার পিতামাতার আকারের তেমন সৌসাদৃশ্য থাকে না। বড় হইয়া ক্রমে পালকের দ্বারা আবৃত হইলে পর পিতামাতার মত দেখা যায়। পাখীর ঠোঁট আছে, কিন্তু কোন পাখীরই মুখে দাঁত দেখিতে পাইবে না। পাখীর পুচ্ছ সরীসৃপের লাঙ্গুল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। ইহা কতকগুলি পালকের সমষ্টিমাত্র। অস্থি মাংস ইহাতে কিছুই থাকে না।

আকারে পাখী এবং সরীসৃপের মাঝামাঝি কোন প্রাণী বর্ত্তমানে দেখা না গেলেও কোন সময়েই যে ছিল না একথা বলা চলে না। অতি প্রাচীন-কালে পৃথিবীতে যে এই প্রকার প্রাণী বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়ার অন্তর্গত সোলেনোপনে চুনা পাথরের ভিতর, এরূপ একটি পাখীর শুষ্ক কঙ্কালের কতক অংশ পাওয়া গিয়াছিল। পর বৎসর অনুসন্ধানের ফলে এরূপ আরও একটি পাখীর কঙ্কাল পাওয়া যায়। তাহা বর্ত্তমানে লণ্ডনের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ইহা দেখিতে

কাকের মত কিন্তু ঠোঁটেব স্থানে দাঁত সংযুক্ত চোয়াল আছে। লেজ সরীসৃপের মত লম্বা এবং লেজেব প্রত্যেক অস্থিখণ্ডের দুইধাব পালকসংযুক্ত। এরূপ জীবিত কোন প্রাণী বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাহ্যিক আববণ স্বরূপ সকল পাখীবই পালক থাকাতে, এবং প্রায সকল পাখীই আকাশে উডিয়া বেডাইতে পাবে বলিয়া, ইহাদিগকে অন্য কোন প্রাণী বলিয়া ভুল হইবাব বিন্দুমাত্রও যে সন্দেহ নাই, তাহা বোধ হয় তোমবা সকলেই বুঝিতে পাবিযাছ। সুবিধামত উড়িয়া বেড়াইবার জন্য সকল পাখীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সম্পূর্ণরূপ উডিবাব উপযোগী হাল্‌কা ভাবে গঠিত হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাদেব কঙ্কালেব ভিতব স্থানে স্থানে বায়ুপূর্ণ ফাঁপা যায়গা আছে। পালকগুলি যে কতটা হাল্‌কা, তাহা তোমরা বাজহাঁসেব বড একটি পালক দিয়া যখন কোন কিছু লিখিয়া থাক, তখনই তাহা বুঝিতে পাব। প্রত্যেক পালকেব নীচেব অংশ ফাঁপা থাকে। বাজহাঁসেব পালকেব এই অংশই তোমবা কাটিয়া কলম প্রস্তুত কব।

পাখীর অঙ্গে চর্ম্মেব উপর, সব যায়গাতে পালক জন্মে না। কোন কোন নির্দ্দিষ্ট যায়গাতেই শুধু পালকেব উৎপত্তি হইতে দেখা যায। তাহাদেবই মাঝে মাঝে আবার পালকহীন যায়গা থাকে। এই সকল বিষয় এখন হইতে তোমবা নিজেরাও পবীক্ষা করিয়া দেখিবে। পাখীব দেহে সাধাবণতঃ তিন বকমেব পালক দেখিতে পাওয়া যায়। বড় রকমের পালকগুলি শুধু পাখীব ডানা ও পুচ্ছের মধ্যেই দেখিতে পাইবে। পাখীব দেহ, ছোট ও কোমল যে কতকগুলি পালক দ্বাবা আবৃত থাকে, তাহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাডা সূতার মত অন্য আব এক বকমের পালক, পক্ষীদেহের উপর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাবা সকলেই দেহেব চর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাখীর দেহ, এই সকল পালকেব আববণে আবৃত থাকাতে, ইহাদের দেহের উত্তাপ সকল সময়েই একরূপ থাকে। বাহিরের তাপের ন্যুনাধিক্যে তাহাদের দেহের উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। পাখীর পালক সর্ব্বদাই মসৃণ এবং তৈলাক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের পালকের এই স্নেহময়

পদার্থ তাহারা তাহাদের পুচ্ছের নীচের তৈলপূর্ণ গণ্ডমালা হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পাখীগুলি উড়িবার সময় তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে পরিবর্তন হইয়া থাকে, তাহা তোমরা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। ইহাদের দেহই এরূপ ভাবে গঠিত যে তাহারা বায়ুরাশির ভিতর দিয়া উড়িয়া যাইবার সময় বায়ু হইতে খুব কম বাঁধাই প্রাপ্ত হয়। ইহারা ইহাদের পুচ্ছের সাহায্যেই ইহাদের গতির দিক নির্ণয় করিয়া থাকে। পাখীগুলি উড়িবার সময় তাহাদের ডানা যতই উপরের দিকে উঠিতে থাকে, তাহাদের দেহ ততই নীচের দিকে নামিয়া



উটপাখী

আসে, আবার উপরের দিকে উঠিবার সময় ডানাগুলি নীচের দিকেই বেশী নামিয়া থাকে। এসব বিষয় পাখীগুলি উড়িবার সময় লক্ষ্য করিয়া না দেখিলে বুঝিবার পক্ষে তেমন সুবিধা হইবে না। পাখীর মধ্যে উড়িতে অক্ষম

এমন পাখীর সংখ্যা খুবই কম। আফ্রিকার উটপাখী কিন্তু ইহাদের একটি মস্তবড় উদাহরণ। এই সকল পাখী উড়িতে পারে না বলিয়া ইহাদের ডানা এবং পুচ্ছ শরীরের অনুপাতে নিতান্ত ছোট হইয়া থাকে।

অধিকাংশ পাখীর পালকই খুব উজ্জ্বল রঙ্গে রঞ্জিত থাকে। মর্দ্দা ও মাদী পাখীর পালকের রঙ্গে সময় সময় খুবই তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। পাখীর মধ্যে কাহারও কাহারও কণ্ঠস্বর বেশ মধুর। আবার কতকগুলির স্বর নিতান্ত কর্কশ। একটু লক্ষ্য করিলে শব্দ শুনিয়াই তোমরা অনেক পাখীর নাম বলিতে পারিবে। প্রায় সকল পাখীই ডিম্ব প্রসব এবং বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য বাসা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বাসা প্রস্তুত প্রণালী ও বাসার আকার, সকল পাখীর একরূপ নয়। এখানে তোমাদের পরিচিত যে কয়েকটি পাখীর কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে, তাহাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তোমরা এসকল বিষয়ের অনুসন্ধান কবিও।

যে কতকগুলি পাখীব শব্দ শুনিবামাত্রই তোমরা তাহাদিগকে না দেখিলেও চিনিতে পার, প্রথমতঃ তাহাদেরই কয়েকটির কথা এখানে বলা হইতেছে। কাক, কোকিল, কবুতর, চড়াই, পাতিহাঁস, রাজহাঁস, মোরগ, চিল প্রভৃতি পাখীগুলির শব্দ তোমরা শুনিয়াছ। এই সকল পাখীর শব্দ অন্য কোন পাখীর শব্দের সঙ্গেই ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদের শব্দ তোমরা একবার শুনিলেই অনায়াসে চিনিতে পারিবে।

কাক

পাখীর মধ্যে কাক তোমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত। তাহার কারণ এই যে, কাক প্রায় সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

কাকের রং, আকার কিংবা গলার স্বর—কোনটিই কেহ পছন্দ করে না, কিন্তু ইহাদেব বুদ্ধির জন্য সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ বাঁশের ঝাড় অথবা পড়ো ভাঙ্গা মন্দিবে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহাদের স্বজাতি-প্রীতি বড় প্রবল। ইহারা স্বভাবতঃই কলরব করিতে ভালবাসে।

আমাদের দেশে দুই রকম কাক দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, দাঁড়কাক ও পাতিকাক। তাহাদিগের মধ্যে দাঁড়কাক পাতিকাকের চাইতে আকারে অনেক বড়। দাঁড়কাকের রং ঘন কৃষ্ণবর্ণ। রৌদ্রে ইহাদের পালকের রং



পাতিকাক ও দাড়কাক

চকচক্ করিতে থাকে। পাতিকাক আকারে ছোট এবং ইহাদের গলা ও বুকের রং ধূসর। ডানা, লেজ, মাথা, ঠোঁট রীতিমত কাল। ইহাদের ঠোঁটের আগা নীচের দিকে একটু বাঁকা, পায়ের আঙ্গুলে তীক্ষ্ণ নখ আছে। ইহারা অনায়াসে গাছের শাখা ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারে।

তাহারা ধান, কলাই প্রভৃতি শস্য খাইয়া থাকে। তাহারা একদিকে যেমন শস্যের অপচয় করে, তেমনি আবার শস্যের অপকারী ইঁদুর ও নানা রকমের পোকা বধ করিয়া শস্যের উপকারও করিয়া থাকে। গরু-বাছুরের গায়ে একরকম পোকা হয়, কাক তাহা খাইতে বড় ভালবাসে।

ডিম পাড়িবার সময় হইলে, কাক খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া মস্তবড় বাসা বাঁধে। ইহারা একেবারে চারিটি হইতে সাতটি পর্য্যন্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিমের রং নীলাভ সাদা ও তাহাতে কাল গোলাকার বিন্দু বিন্দু চিহ্ন থাকে। আমাদের দেশে বৈশাখ মাসেই, কাকে ডিম পাড়িবার জন্য বাসা বাঁধে ও ডিম পাড়ে।

চড়াই পাখী

চড়াই বড় চঞ্চল প্রকৃতির পাখী। কখনও এক যায়গাতে এক মিনিটের জন্যও স্থিব হইয়া বসিয়া থাকিতে পাবে না। ইহাবা কিচির-মিচির শব্দ করিয়া কান ঝালাপালা করিয়া দেয়। মানুষ, গরু কাহাবও কাছে যাইতে তাহাবা বিশেষ ভয় পায় না; ইহাবা কিন্তু আবাব কিছুতেই পোষ মানিতেও চায় না। পিঁজবাব ভিতবে বন্ধ বাখিলে সুবিধা পাইলেই উড়িযা পালায়, অথবা মবিয়া যায়।

চড়াই পাখী আবাব বিভিন্ন বকমেব দেখিতে পাওযা যায়। বঙ্গেব তাবতম্যই তাহাদেব মধ্যে প্রধান। যে সকল চড়াই পাখী কাঁচাবাড়ীব চালেব ফাঁকে অথবা পাকা বাড়ীর কড়ি ববগার ফাঁকে বাসা বাঁধিয়া থাকে, তাহাবাই তোমাদের সঙ্গে বিশেষভাবে পবিচিত।



চড়াই পাখী

চড়াই পাখীব ডানা তাহার দেহের অনুপাতে বেশ বড়। ডানার নীচেব দিকের পালকগুলি ছোট ও তূলাব মত কোমল। তাহাদের ঠোঁটের আগা বেশ সূচল হয়। তাহা দ্বারা, ইহারা অতি সহজেই মাটি হইতে শস্যকণাগুলি খুঁটিয়া তোলে এবং খায়। তাহাদেব পায়ে সামনের দিকে তিনটি সরু লম্বা অঙ্গুলী থাকে। পিছন দিকের অঙ্গুলী অপেক্ষাকৃত ছোট।

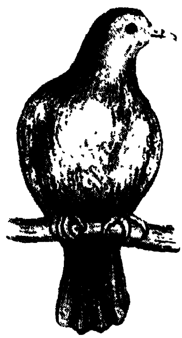
এই অঙ্গুলীর সাহায্যে তাহারা গাছের ডাল কিংবা সরু কোনরূপ আশ্রয় সজোরে ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। তাহারা অনেক কীট-পতঙ্গও খাইয়া থাকে। সাধারণতঃ তাহারা পাখীর পালক দিয়া বাসা তৈয়ার করিয়া ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা বড় হইলেই পুনরায় ডিম পাড়িয়া থাকে।

কবুতর

আমাদের দেশে গৃহপালিত যে সকল কবুতর আছে, তাহাদের পালকের রং সাদা, কটা, ব্লু প্রভৃতি নানা রকমই দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি বন্য কবুতর, সচরাচর পুরাতন দালান ও ঘরের ভিতরকার ছাদের উপরে বাসা বাঁধিয়া, দলে দলে বাস করে।



উড়ন্ত কবুতর



বসা কবুতর

তাহাদের পালক কাল এবং ব্লু রঙ্গে রঞ্জিত থাকে এবং সকলেরই পালকের রং একরূপ। তাহাদিগকে জালালী কবুতর বলিয়া থাকে। তাহারা গৃহপালিত কবুতর হইতে আকারে কিঞ্চিৎ ছোট। মর্দ্দা এবং মাদী কপোত সর্ব্বদাই একসঙ্গে বাস করে। তাহারা দেখিতে যেমন সুন্দর তাহাদের মাংসও আবার তেমনি সুখাদ্য। এই উভয় কারণেই লোকে ইহাদিগকে যত্ন করিয়া পুষিয়া থাকে। তাহাদের দেহের গঠন দীর্ঘ, মাথা গোলাকার এবং অপেক্ষাকৃত ছোট। ঠোঁট সরু ও লম্বা, তাহার অগ্রভাগ আবার কিঞ্চিৎ বাঁকা। ইহাতে তাহাদের খাদ্য শস্য ধান, চাল, ডাল ইত্যাদি খুঁটিয়া খাওয়ার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। তাহাদের পাখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও সবল থাকাতে, তাহারা শত শত মাইলের

পথও তাড়াতাড়ি অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে। পায়ে লম্বা লম্বা চারিটা বাঁকা সূচল নখর সংযুক্ত অঙ্গুলী আছে, এগুলির সাহায্যে তাহারা অতি সহজেই গাছের শাখায় বসিয়া থাকিতে পারে।

মাদী কবুতর একবারে দুইটির অধিক ডিম পাড়ে না। ডিম হইতে বাহির হইবার সময় তাহাদের ছানার অঙ্গে একেবারেই পালক থাকে না।

তাহাদের কণ্ঠস্বর মধুর। খুব ভোরে ও রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে, মর্দ্দা কবুতরের শব্দ বড় সুন্দর শুনায়। কখন কখন দিনের বেলায়ও তাহারা মনের আনন্দে শব্দ করিয়া থাকে।

মোরগ

মোরগ আর একটি গৃহপালিত পক্ষী। তাহাদের মাথায় লালবর্ণের বেশ বড় ঝুটি, ও সর্ব্বাঙ্গ পালকে আবৃত। গলার নীচেও দুইটি লাল চর্ম্মখণ্ড পর্দ্দার মত ঝুলান থাকে। মোরগের পালক নানাপ্রকার সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। মাদী মোরগকে মুরগী বলিয়া থাকে। ইহা আকারে মোরগের চাইতে ছোট হইলেও কবুতরের চাইতে অনেক বড়। তাহাদের ঠোঁট পায়রার চাইতে খাট হইলেও বেশ সবল। গৃহপালিত মোরগের উড়িবার ক্ষমতা চলিয়া যায় বটে, কিন্তু বন্য মোরগের উড়িবার ক্ষমতা অসাধারণ। ইহাদের চোখ দুটি বড় ও উজ্জ্বল। পায়ের আকার যেমন মোটা তেমনি আবার বেশ বলিষ্ঠ। বড় বড় শল্কের দ্বারা তাহা আবৃত থাকে। ইহাদের অঙ্গুলি অপেক্ষাকৃত মোটা ও সংযুক্ত। নখ দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া তাহারা মাটি হইতে নানা রকম পোকা ও শস্য বাহির করিয়া খাইয়া থাকে।



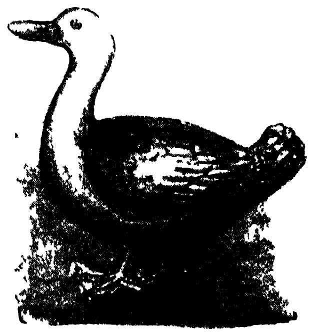
মোরগ

তাহারা একে একে অনেকগুলি ডিম পাড়িয়া তাহাব উপর বসিয়া তা দেয় এবং একবাবে অনেকগুলি ছানা হইয়া থাকে। মোরগ ছানাগুলিকে সঙ্গে নিয়া খাদ্য অন্বেষণে বাহিব হয় এবং নিজেরাই মাটি খুঁড়িয়া খাদ্য বাহির করিয়া দেয়। মোরগের ডিম ও মাংস মানুষেব খাদ্য।

ইহাদের কণ্ঠ দূব হইতে বেশ মিষ্ট শুনায়। বাত্রিকালে প্রহবে প্রহরে ইহারা খুব উচ্চৈঃস্ববে শব্দ কবে। সেই শব্দ বহুদূব হইতে শুনা যায়। দেশে যখন ঘড়ীব প্রচলন ছিল না, তখন ইহাদেবই শব্দ শুনিয়া লোকে রাত্রিকালে সময় নির্দ্ধারণ কবিত।

পাতিহাঁস

গৃহপালিত কবুতর ও মোরগেব মত পাতিহাঁসও নানাবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহপালিত পাতিহাঁসেরও পোষা মুবগীব ন্যায় উড়িবাব ক্ষমতা চলিয়া যায়। বন্য পাতিহাঁসেব পাখা বেশ সবল ও পুষ্ট। ইহারা অল্প সময়ের মধ্যেই শত শত মাইল অতিক্রম কবিয়া যাইতে পাবে। পাতিহাঁসেব চক্ষু উজ্জ্বল, ঠোঁট বেশ বড়, মোটা এবং চেপ্টা। নীচেব ঠোঁট কতকটা চামচের মত, গলা বেশ লম্বা এবং বাঁকা—ইচ্ছামত সকল দিকেই নাড়াচাড়া করিতে পারে। পুচ্ছ বেঁটে ও উপব দিকে



পাতিহাঁস

একটু উঠান থাকে। পা দুটি বেশ মোটা, খাট এবং অপেক্ষাকৃত পিছন দিকে। পায়ের সম্মুখ দিকের অঙ্গুলী তিনটি চর্ম্মের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। ইহারই সাহায্যে ইহারা জলের উপর অনায়াসে সাঁতার কাটিতে পারে অথচ মাটির উপর দিয়া চলাফেরা করিতেও ইহাদের কোন অসুবিধা হয় না। ইহারা জলের

নীচে মাথা ডুবাইয়া এবং পাঁকের মধ্য হইতে পোকা, শামুক ও শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া খাইয়া থাকে। শামুক ও কেঁচো ইহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। ইহারা দলবদ্ধ হইয়াই বাস করিতে ভালবাসে।

মোরগের মত ইহারাও একে একে অনেকগুলি ডিম পাড়িয়া তাহার উপর বসিয়া তা দেয় এবং একবারে বহু শাবক উৎপাদন করে। ইহাদের ডিম এবং মাংস উভয়ই মানুষের খাদ্য।

মাদী পাতিহাঁস খুব উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়া থাকে, তাহা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ; কিন্তু মর্দ্দা পাতিহাঁসের গলার স্বর অস্পষ্ট ও কর্কশ।

পাতিহাঁসের মত রাজহাঁসও আর একটি গৃহপালিত পাখী। তোমরা রাজহাঁসও পরীক্ষা করিয়া ইহাদের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে পার।

কোকিল

কোকিল আমাদের দেশে বৎসরে মাত্র কয়েক মাস বাস করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের মধুর কুহু কুহু রবের জন্য, তাহারা সকলেরই পরিচিত। তাহাদিগকে তোমরা খুব কমই দেখিতে পাইবে, কারণ পল্লবের আড়ালে লুকাইয়া থাকিতেই তাহারা ভালবাসে। বসন্তকালে অর্থাৎ শীতের শেষেই ইহারা এদেশে আসে এবং গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত বাস করে। দিনের বেলা তাহারা অনবরত শব্দ করে। মর্দ্দা পাখীর শব্দই বিশেষভাবে তোমাদের পরিচিত। মাদী কোকিলের শব্দ নিতান্ত কর্কশ; ইহাদের এই অপ্রীতিকর শব্দের দরুণ অনেকে ইহাদিগকে শ্মশান-কোকিল বলিয়া থাকে।



কোকিলের মুখ

মর্দ্দা ও মাদী কোকিলের শুধু স্বব কেন, তাহাদের পালকেব রঙ্গেও পরস্পর বিশেষ পার্থক্য আছে। পুং-কোকিলের পালকের রং কাল এবং চকচকে। মাদী কোকিলের রং ধূসর ; মাথা, গলা, পাখা এবং পুচ্ছের উপর এছাড়া সাদা সাদা চিহ্নও আছে। ইহাদের ঠোঁটের রং সাদাটে সবুজ ; চক্ষুগুলি রক্তের মত লাল। পা তুইটি শল্কের দ্বারা আবৃত ; পায়ের নখ কাল এবং কঠিন।

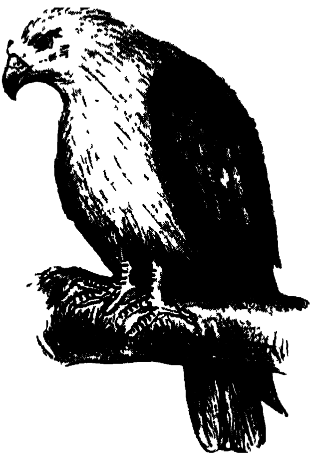
সাধারণতঃ তাহারা গাছেব ফল খাইয়াই জীবন ধাবণ করে। গৃহপালিত কোকিলকে মাংস খাইতেও দেখা যায়।

মাঘেব শেষে ডিম পাড়িবাব সময় হইলেই, ইহারা শব্দ করিতে আবম্ভ করে। মাদী কোকিল ডিম পাড়িয়া অন্য কোন পাখীর বাসাতে রাখিয়া আসে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ কাকের বাসাতেই কোকিলের শাবক প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। মর্দ্দা কোকিল কাকের বাসাতে উপস্থিত হইলেই কাক বাসা ছাড়িয়া তাহার পিছন পিছন তাড়া করে, এই অবসবে মাদী কোকিল তাহার ডিম কাকের বাসাতে রাখিয়া আসে। যদিও কোকিলের ডিমের আকার, কাকের ডিমের চাইতে ছোট, এবং রংও কতকটা ভিন্ন রকমের, তথাপি কাক ফিরিয়া আসিয়া কোকিলের এই চালাকী ধরিতে পারে না ;—নিরাপত্যে কোকিলের ডিমেও তা দিতে থাকে। এই জন্য কাকের বাসাতেই কোকিলের ছানা দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণী চিল

ইহা আব একটি অতি সাধারণ পাখী। এই পাখী শুক্না খাল, বিল, নদী কিংবা পুকুরের ধারে গাছের শাখাতে মাছ ধরিবার জন্য বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহার মাথা, গলা ও বুকের নীচের দিকের রং সাদা। পাখার পালকের রং লালচে এবং কটা। ইহাদের বিকট চিঁ চিঁ রব দিনের বেলা অনেক সময়ে শুনা গিয়া থাকে। ইহাদের ঠোঁট বাঁকা এবং দৃঢ় ; ঠোঁটের

রং নীলাভ সাদা, উপরের দিকে কিঞ্চিত পীতাভ—চোখের রং কটা—পা এবং অঙ্গুলীর রং সবুজ ও পীতাভ।



ব্রাহ্মণী চিল

জলের উপর যে সকল ছোট ছোট মাছ ভাসিতে থাকে, ইহারা হঠাৎ ছোঁ মারিয়া তাহাদিগকে থাবা দিয়া ধরে এবং গাছের ডালে বসিয়া ঠোঁট দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া থাকে। এইরূপভাবে কখনও কখনও ধানক্ষেতের কিনারা হইতেও ইহারা ব্যাঙ্, কাঁকড়া ধরিয়া খায়। ছোট ছোট পাখী নিতান্ত দুর্ব্বল না হইলে, তাহারা কখনও আক্রমণ করিতে সাহস করে না।

ইহারা সাধারণতঃ মাত্র দুইটি ডিম পাড়িয়া থাকে। কদাচিৎ তিনটি ডিম পাড়িতেও দেখা যায়। গাছের সরু সরু ডাল, শুক্‌না পাতা এবং খড়কুটার দ্বারা ইহারা বাসা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

শকুন

পাখীর মধ্যে শকুন মানুষের বড় উপকার করিয়া থাকে। মৃত জীবজন্তুর দেহ মাটিতে পড়িয়া পচিতে থাকিলে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ অনিষ্ট হইতে পারে। শকুন এই সকল মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করিয়া মানুষকে নানা প্রকার ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করে। সচরাচর শকুন বড় দেখা যায় না, কিন্তু গো-ভাগাড় কিংবা অন্য কোন যায়গায়, যেখানে মৃত জন্তুর দেহ পড়িয়া থাকে, সেখানে তাহারা দলে দলে আসিয়া হাজির হয়। ইহারা সচরাচর নির্জ্জন জঙ্গলের ভিতর, গাছের শাখায় বাস করিতে ভালবাসে। সেই জন্যই তোমরা ইহাদিগকে সকল সময় দেখিতে পাও না।

ইহাদেব শবীবেব রং মেটে কাল। স্থানে স্থানে সাদা পালকও থাকে। গলা লম্বা এবং অপেক্ষাকৃত সরু। ডানা দুইটি বেশ বড় এবং সবল। ইহার সাহায্যে তাহাবা সুদূর আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পাবে। মাথায় কোন বকম পালক থাকে না। মাথা ও গলার চামড়াব রং মেটে সাদা। ঠোঁট বেশ লম্বা ও কঠিন। ইহাব অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বাঁকা এবং তীক্ষ্ণ। ঠোঁটেব বং কটা। অক্ষি-গোলকেব বং ঘন কটা। ইহাদেব দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর। কোথায় মৃত জন্তুব দেহ পড়িয়া আছে তাহা তাহারা সুদূব আকাশ হইতে দেখিতে পাবে। নানা বকমেব শকুন আছে, কিন্তু সচরাচর যে শকুন আমবা দেখিয়া থাকি, তাহাব গলায় বা মাথায় কোন পালক থাকে না।



শকুন

গাছেব ডালপালা ভাঙ্গিয়া আনিয়া তাহাবা বাসা প্রস্তুত করে। মাঘ ফাল্গুন মাসেই তাহাদেব ডিম পাড়িবাব সময়। ইহাবা একেবাবে একটি মাত্র ডিম পাড়ে। ডিমের রং সাদা এবং আকারেও বেশ বড হয়।

বাবুই

ছোট পাখীব মাধ্য বাবুই পাখী বড় নিপুণ ও পরিশ্রমী। ভারতেব প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাবা বিচরণ করিয়া থাকে। এদেশে মাত্র কয়েক মাস ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা তাল প্রভৃতি গাছেব পাতা ছিঁড়িয়া তাহাদ্বারা নীচের দিকে মুখ কবিয়া কুঁজোর মত সুন্দর বাসা বুনিয়া থাকে। বাসাগুলি গাছেব আগায় বাতাসে দুলিতে থাকে। গ্রীষ্মকালেই ইহারা বাসা বাঁধে এবং একবারে দুইটি কি তিনটি ডিম পাড়িয়া থাকে।

পালকের রং বৎসরের সব সময় একরূপ থাকে না। মর্দ্দা পাখীর পালকের রং বেশী পরিবর্ত্তিত হয়। পালকের রং শরতের শেষে একবার পরিবর্ত্তিত হয়; পুনরায় বসন্তের শেষে রঙ্গের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। হল্‌দে, কাল, কটা প্রভৃতি নানা রকম রঙ্গে তাহাদের দেহের নানা স্থান উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত হইয়া যায়। চড়াই পাখীর মত ইহারাও বড় চঞ্চল এবং প্রায় সর্ব্বদাই কিচিরমিচির শব্দ করে। আকারে চড়াই পাখীর চাইতেও ইহারা কিঞ্চিৎ ছোট। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে। এজন্য এক একটি গাছে ইহাদের বহু বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শস্যের বিশেষ অনিষ্টকারী, যখন যে ক্ষেত্রে দল বাঁধিয়া শস্য সংগ্রহ করিতে যায়, তাহা প্রায় শস্যহীন করিয়া ফেলে। এই জন্য সময় সময় ক্ষেত্রের মালিক পাহারা দিয়া তাহাদের হাত হইতে ক্ষেত রক্ষা করিতে বাধ্য হয়।


বাবুই

এখানে মাত্র কয়েকটি পরিচিত সাধারণ পাখীর কথা আলোচনা করা হইল। এ ছাড়া আরও বহু পরিচিত পাখী আছে। তাহাদের কতগুলির নাম তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেগুলির বিষয়ও তোমরা মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সকল রকম তত্ত্ব জানিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে।

পাখীর বিষয় আলোচনা কালে, মানুষের সঙ্গে কোন্ পাখীর কিরূপ সম্বন্ধ তাহার বিষয়ও তোমরা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবে। কতক-গুলি পাখী মানুষের উপকারী বন্ধু; আর কতকগুলি মানুষের পরম শত্রু। মানুষের পক্ষে শকুন কেন যে পরম উপকারী বন্ধুস্বরূপ তাহা

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তারপব ধর পেঁচক পাখীর কথা। দিনের বেলা পেঁচক পাখী গর্ত্ত হইতে বাহির হয় না বটে, কিন্তু রাত্রিকালে ইঁদুর, ন্যাংটি ইঁদুর প্রভৃতি বধ কবিয়া শস্যের কতকগুলি শত্রু নাশ করে; সুতরাং পেঁচককে উপকারী বলিয়াই ধরিতে পার। এরূপ আরও অনেক আছে। অনিষ্টকারী পাখীর মধ্যে বাবুই পাখীর কথা এইমাত্রই বলা হইয়াছে। তারপর কাঠঠুক্রা পাখী যাহারা গাছের ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে, তাহারা এরূপভাবে বাসা নির্ম্মাণ করাতে বহু মূল্যবান গাছ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহারা যে অনিষ্টকারী পাখী সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু কোন কোন সময়ে ইহারা গাছের বিশেষ উপকারও করিয়া থাকে। তোমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, এই পাখীগুলি গাছের কাণ্ডের উপর অবলীলাক্রমে, উপব এবং নীচেব দিকে পায়ে হাটিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে চলিবাব সময় তাহারা ঠোঁট দিয়া কাণ্ডের উপর অনবরত আঘাত করে। ইহাব ফলে কাণ্ডেব ভিতরে গর্ত্তমধ্যে কোথাও যদি কোন কীট থাকে, তবে তাহারা নড়াচডা করে। এই পাখী তাহাদের সেই নড়াচড়া অতি সহজেই বুঝিতে পারে। কোথাও এরূপ কোন কীটের অস্তিত্ব টের পাইলে তাহারা তখনই সেখানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া কীটগুলিকে বাহির করে এবং খাইয়া ফেলে। দেখ দেখি ইহাতে গাছেব কতটা উপকার হইল। সুতরাং আপাততঃ যে সকল পাখীকে আমরা সম্পূর্ণ অনিষ্টকারী বলিয়া মনে করি, তাহাদ্বারাই আমাদের অজ্ঞাতে যে কি উপকার সাধিত হয় তাহা কে বলিতে পারে? সে জন্য কোন পাখীকে অপকারী মনে হইলেই, তাহার বংশ ধ্বংস করা কখনই সঙ্গত নহে। এইরূপ অনেক পাখী আছে যাহারা একদিকে যেমন অপকার করিয়া থাকে, অন্যদিকে আবার বিশেষ হিতজনক কার্য্যও করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্তন্যপায়ী প্রাণী

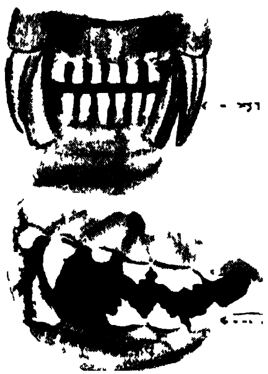
জীবজগতে স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্থান সকলেব উপর। স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহারা জন্মের পর মুহূর্ত্ত হইতে মায়ের বুকের দুধ খাইতে আরম্ভ করে। ইহাদের দেহ, সাধারণতঃ রোমের দ্বারা আবৃত থাকে। শরীরের রক্ত উষ্ণ এবং হৃদয় চারিটি কুঠরীবিশিষ্ট। তাহারা ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে। স্তন্যপায়ী প্রায় সকল প্রাণীই স্থলচর। অবশ্য ইহাদের মধ্যে খেচর এবং জলচব প্রাণীও যে একেবারে নাই তাহা বলা চলে না। খেচরের মধ্যে বাদুর এবং চামচিকার বাচ্চা মায়ের বুকের দুধ পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। জলচর স্তন্যপায়ীর মধ্যে ছোট বড় নানা আকাবের তিমি ও শুশুক তোমরা হয় ত সকলে দেখ নাই, কিন্তু ইহাদের নাম তোমাদের কাহারও অজানা নাই। ইহারাই জলচর স্তন্যপায়ীর উদাহরণ। তোমাদের পরিচিত স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীর ত আর অভাব নাই। ইঁদুর, বিড়াল, কাঠবিড়ালী, কুকুর, শৃগাল, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ছাগল, হরিণ, ভেরা, গরু, ঘোড়া, মহিষ, গর্দ্দভ, উট, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি সকল প্রাণীই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তোমরা একটু চিন্তা করিলে এছাড়া আরও অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম করিতে পার। জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তোমরাও যে এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। ইহাদের সংখ্যাধিক্যের দরুণ ইহাদিগকে বহু শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া তবে, ইহাদের সকলের বিষয় আলোচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর, বহু বিভিন্ন রকম আকার দেখিতে পাওয়া যায়। সকল পাখীরই আকারগত একটা সাদৃশ্য আছে কিন্তু স্তন্যপায়ীতে

তেমন কোন সাদৃশ্য নাই। ক্ষুদ্রকায় ইঁদুর হইতে বিশালকায় হস্তী পর্য্যন্ত, সকল প্রাণীই স্তন্যপায়ী। জলচর তিমি ছাড়া, এই শ্রেণীর আর সকল প্রাণীরই চারিটি করিয়া প্রত্যঙ্গ আছে। ইহাদের সকলেরই বুক এবং উদরের গর্ত্তের মাঝে মাংসল একটি পর্দ্দা থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিবার পক্ষে ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই সকল প্রাণীর দেহের ভিতরকার এই পর্দ্দা তোমরা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পার। স্তন্যপায়ী প্রাণীর আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় একভাবেই থাকে। বাহ্যিক প্রাকৃতিক অবস্থা, ঠাণ্ডা কিংবা গরম, যে কোন রকমেই থাকুক না কেন, স্বাভাবিক অবস্থায় এই সকল প্রাণী-দেহের উত্তাপ একই রকম থাকে। ইহাদের শরীরের চর্ম্ম গণ্ডে পরিপূর্ণ এবং পাখী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এই শ্রেণীর অধিকাংশ প্রাণীরই লেজ থাকে। এই লেজের সাহায্যে তাহাদের গাছে চড়িবার পক্ষে সুবিধা হয়। সাঁতারকাটা, এবং মাছি তাড়ান প্রভৃতি কাজের জন্যও ইহার ব্যবহার করে।

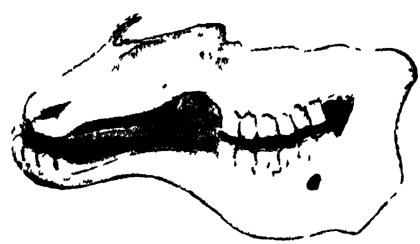
স্তন্যপায়ী প্রাণীর মুখে সাধারণতঃ দুই পাটি দাঁত থাকে। ইহাদের খাদ্যের প্রকার ভেদে, দাঁত ও তাহার বিন্যাস প্রণালীর তারতম্য হয়। তোমাদের পরিচিত যে সকল প্রাণী তোমবা সচরাচর দেখিতে পাও, তাহাদের দাঁতের গঠন এবং বিন্যাস প্রণালী লক্ষ্য করিলেই, ইহা বুঝিতে পারিবে। এই সকল প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি তৃণভোজী ও কতকগুলি মাংসাশী। ইহাদের মধ্যে আবার মাংস এবং উদ্ভিদ এই উভয় ভোজীও যে না আছে তাহা নহে। ভল্লুকই এই শ্রেণীর প্রাণী। খাদ্য সম্বন্ধে মানুষের নামও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাণীর মধ্যে শূকর কিন্তু সকল রকম খাদ্যই খাইয়া থাকে। এজন্য তাহাকে সর্ব্বভুক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদাহরণ স্বরূপ দুই চারিটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর দন্ত বিন্যাস প্রণালীর কথা উল্লেখ করা হইল।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে মাংসাশী প্রাণীর (carnivora) সংখ্যাই বেশী। বিড়াল, কুকুর, শৃগাল, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি তোমাদের পরিচিত প্রাণীই ইহার

উদাহরণ। খাদ্যের তারতম্য অনুসারে মুখের,—বিশেষতঃ চোয়ালের এবং দাঁতের আকারে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মাংসাশী প্রাণীর উপর নীচ উভয় চোয়ালের সম্মুখস্থিত কর্ত্তন-দন্তগুলি খুব তীক্ষ্ণ থাকে। তাহাদেরই দুই পার্শ্বে একটি একটি কবিয়া দুইটি শ্বাদন্ত থাকে, ইহারা অন্যান্য দাঁতের চাইতে সূচল এবং লম্বা। তৃণভোজী প্রাণী অর্থাৎ ছাগল, ভেড়া, হরিণ, গরু, ঘোড়া মহিষ প্রভৃতি প্রাণীর চোয়ালে এই দাঁত থাকে না। মাংসাশী প্রাণীর চোয়ালেব শেষ প্রান্তে যে দাঁত থাকে তাহারা মাংস কাটিবার এবং ছিঁড়িবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহারা মাংস গিলিয়া খায় বলিয়া চর্ব্বণ-দন্ত বলিয়া ইহাদের অন্য কোন দন্ত নাই। বিড়াল এবং কুকুবেব দাঁত তোমরা ইচ্ছা করিলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। বিড়াল এবং কুকুরের চোয়ালের সম্মুখে, উপর নীচে, চারিটি তীক্ষ্ণ সূচল এবং লম্বা শ্বাদন্ত আছে। তা ছাড়া চোয়ালের প্রত্যেক প্রান্তে ছয়টি ছয়টি কবিয়া আরও চব্বিশটি ছেদন-দন্ত দেখিতে পাইবে। তৃণভোজীব মধ্যে ছাগল ও গরুর দাঁত তোমরা অতি সহজেই দেখিতে পার। ইহাদেব নীচের চোয়ালের সম্মুখদিকে আটটি কর্ত্তন-দন্ত আছে। উপরের চোয়ালের সম্মুখদিকে দাঁতের স্থানে শুধু একটি গদি থাকে। ইহারা এই গদির উপর চাপ দিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খায়। ঘোড়ার কিন্তু উভয় চোয়ালেব সম্মুখেই ছয়টি ছয়টি করিয়া বারটি কর্ত্তন-দন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সকলেরই চোয়ালের শেষ প্রান্তে ছয়টি ছয়টি করিয়া



বিডালেব চোয়াল



গরুর চোয়াল

চব্বিশটি বড ও দৃঢ চর্ব্বণ-দন্ত থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীব দাঁত নানা আকারের দেখিতে পাওয়া যায। এই' শ্রেণীরই প্রাণী শুশুকের কিন্তু দাঁতের আকার একরূপ। দন্তহীন স্তন্যপায়ী প্রাণী যে একেবারে নাই তাহা বলা চলে না। অবশ্য তাহার সংখ্যা খুবই কম। শল্কাবৃত পিপীলিকাভুক প্রাণী পেঙ্গুলীন (pangulin) ইহাব উদাহরণ।

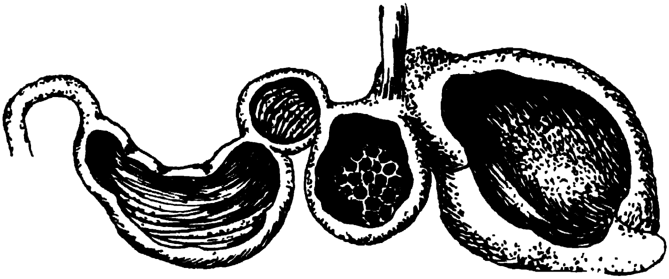
মাংসাশী প্রাণীর দাঁত ছাডা তাহাদের নখ এবং জিব হইতেও তাহাদেব প্রকৃতিব পবিচয় পাওয়া যায়। বিডাল, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি প্রাণী তাহাদেব নখের সাহায্যে শিকাব ধরে বলিযা নখ খুব তীক্ষ্ণ এবং সবল হয়। ইহাবা হাটিবার সময় এই নখ ইহাদের পায়েব গদীব ভিতব লুকাইয়া রাখে এবং শিকাব ধরিবাব সময বাহির করে। বিডালের পায়ে তোমবা ইহা লক্ষ্য কবিয়া দেখিও। কুকুরেব পায়ের নখ তাহাবা শিকারের সময় ব্যবহার করে না বলিয়া, তাহাদেব নখ তেমন সূচল নয় এবং কখনই পায়েব ভিতরে লুকান থাকে না। মাংসাশী প্রাণীব জিব্ সাধাবণতঃ খুব কর্কশ, তাহা দ্বাবা ইহাবা অস্থি সংলগ্ন মাংস তুলিয়া খাইতে পাবে। তৃণভোজী প্রাণীব পায়ে নখ থাকিলেও মোটেই তাহা সূচল নয়। হস্তী ও গণ্ডাবের নখ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। মাংসাশী প্রাণী কোপন স্বভাব এবং হিংস্র প্রকৃতির, তৃণভোজী প্রাণী সাধারণতঃ শান্ত প্রকৃতিব হইতেই দেখা যায়। তাহাদিগকে অত্যাচার না কবিলে কখনও কাহাব কোন অনিষ্ট করে না।



বিডালেব পায়ের নখ

তৃণভোজী প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি আবাব বোমন্থন অর্থাৎ গিলিত চর্ব্বণ করে। প্রথম একবার ঘাস খাইবা পুনবায় তাহা মুখে আনে এবং চর্ব্বণ করিয়া থাকে। ছাগল, গরু, মহিষ, উট ও হরিণ প্রভৃতি প্রাণী এই শ্রেণীর জন্তু। এজন্য ইহাদের পাকস্থলীও কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের। ইহাদের

পাকস্থলীতে চারিটি কুঠরী আছে। তাহাদের মধ্যে একটা বেশ বড়। ঘাস খাইবার সময় প্রথমতঃ ঘাস ইহাতেই জমা হয়। তারপর পুনরায় মুখে আনিয়া চর্ব্বণ করিলে পব ঘাসগুলি হজম হইয়া থাকে। বড় কুঠরিটি



গরুর পাকস্থলী

একবার ঘাসে পূর্ণ হইলে পরেই এই সকল প্রাণী শুইয়া বিশ্রাম করে। এই সময় লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে ইহারা রোমন্থন করিতেছে। এই শ্রেণীর জন্তুর ক্ষুর সাধারণতঃ মধ্যভাগে দুইখণ্ডে বিভক্ত দেখিতে পাইবে।

তৃণ এবং মাংস এই উভয় খাদ্যই যাহারা খায়, তাহাদের মধ্যে এই উভয় প্রকার প্রাণীর বিশেষত্বেরই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে প্রায় সকলেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে। ইহাতে আত্মরক্ষা এবং শত্রুকে আক্রমণ এই উভয় কার্য্যেরই সুবিধা হয়। গরু, ভেড়া, মহিষ, নেকরে বাঘ, বানর, বিবর প্রভৃতি প্রাণী দলে দলে বাস করে। ইহাদের মধ্যে বিবর দলবদ্ধ হইয়া নানা মত কাজ করিয়া থাকে। বিবরের বাসা নির্ম্মাণ প্রণালী বড়ই আশ্চর্য্যজনক। দলবদ্ধ না হইয়া শুধু একটি কিংবা দুইটি বিবর কখনই এরূপ বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারিত না। বনের ভিতর নদীতীরে, যেখানে বহু বড় বড় গাছ জন্মিয়া থাকে, সেখানে তাহারা তাহাদের সুতীক্ষ্ণ দাঁতের সাহায্যে ঐ সকল গাছ কাটিয়া, নদীর মধ্যে সুদৃঢ় বাঁধ প্রস্তুত করে। গাছের ছালই তাহাদের খাদ্য সুতরাং বাঁধ বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের খাবার জোগারও হইয়া যায়। এই বাঁধের নীচেই তাহারা তাহাদের বাসা নির্ম্মাণ করে।

এই বাঁধ এরূপ দৃঢ় হয় যে নদীর স্রোত অনেক সময় বন্ধ হইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বন্যাব সৃষ্টি কবে। •বিবব আকাবে দুই ফিটের বেশী লম্বা হয় না। বহু প্রাণীই তাহার চাইতে আকাবে বড় আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের সমবেত শক্তির কাছে অনেকেরই শক্তি নিতান্ত সামান্য বলিয়া বোধ হয়। খুব বেশী দিনেব কথা নয়, বিবরের বাঁধে নদীব স্রোত বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে

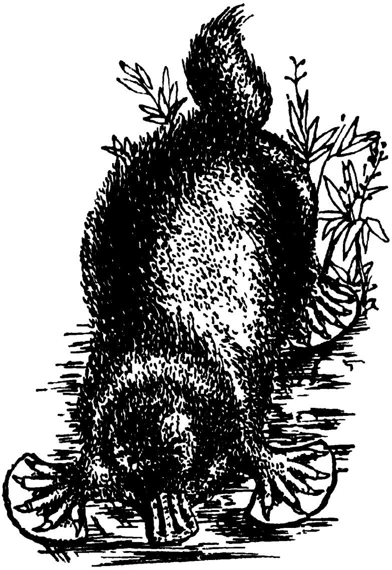


বিবব

একবার বন্যা হইয়া কানাডাব পার্শ্ববর্ত্তী বেল লাইন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিববেব এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্রমাগত চতুর্দ্দশ বার পুনঃ পুনঃ ইহা মেরামতের চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলে, শেষ কালে বিবরের দল স্থান পরিত্যাগ কবিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে উচু নীচু হিসাবে তিনটি স্তর আছে। নিম্নস্তর (Monotremes), মধ্যস্তর (Marsupials) এবং সর্ব্বোচ্চস্তর (Placental)। অষ্ট্রেলিয়া এবং টাস্‌মেনিয়াতে হংসমুখী (Duck mole) নামক এক প্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে তাহারাই এই শ্রেণীর সর্ব্বনিম্ন-স্তরের প্রাণীর উদাহরণ। ইহার দেহের আকার উদ্বিড়াল বা ভোঁদরেব মত, কিন্তু তাহার মুখে পাতিহাঁসের মত ঠোঁট বা চঞ্চু আছে। তোমবা

ইহার ছবি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। লক্ষ্য করিলে ইহাও দেখিতে পাইবে যে ইহার পায়ের অঙ্গুলীগুলি হাঁসের পায়ের অঙ্গুলীর মত পরস্পর সংলগ্ন। কিন্তু নখ্‌গুলি আবার বেশ সবল এবং পুষ্ট। ইহাদের সাহায্যে তাহারা নদীর ধারে মাটীতে গর্ত্ত খুড়িয়া বিশ ত্রিশ ফিট্ মাটীর তলায় বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহারা নদীতে সাঁতড়াইয়া নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে এবং স্তন্য-পায়ী প্রাণী হইলেও পাখীর ন্যায় ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। এছাড়া আরেকটা বড় মজার কথা এই যে, ডিম্ব হইতে বাচ্চার জন্ম হইলে পর ইহাদের মা অর্থাৎ মাদী হংসমুখী, বাচ্চাগুলিকে একটি থলিতে তুলিয়া রাখে। এই থলি তাহার উদরের নিম্নভাগে গঠিত হয় এবং এই থলির ভিতরে বাচ্চাগুলি দুগ্ধ পান করিয়া ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে।



হংসমুখী

তোমরা হয়ত বলিবে যে হংসমুখী যখন পাখীর মত ডিম্ব প্রসব করে, এবং মুখ ও পায়ের আকারও যখন পাখীরই মতন তখন ইহাকে পাখী বলিতে আর দোষ কি? পাখীর সহিত সাধারণতঃ ইহাদের সাদৃশ্য কিন্তু এইখানেই একরূপ শেষ। বাস্তবিক, যে সরীসৃপ হইতে পক্ষীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর। অবশ্য পণ্ডিতদিগের মতে জলচর এবং স্থলচর অধিকাংশ প্রাণীই সরীসৃপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য প্রাণী দেহ ক্রমশঃ যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা একটু পরীক্ষা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু হংসমুখীর দেহ আজ পর্য্যন্ত খুব সামান্য রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। খেচর পাখী কিংবা ভূচর

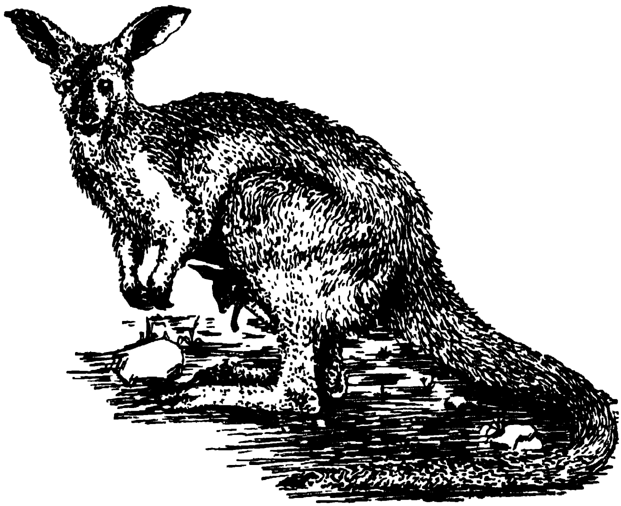
যে কোন স্তন্যপায়ীর রক্ত পরীক্ষা করিলেই গরম বোধ হয়। তাহারা ঠাণ্ডা কিংবা গরম যে কোন দেশেই বাস করুক না কেন ইহার কখনও ব্যতিক্রম হয় না। সর্ব্বদা গরম স্থানে বাস কবিয়াও এই হংসমুখীর রক্ত কিন্তু সরীসৃপেরই মত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। ইহাতেই ইহার, স্তন্যপায়ী প্রাণী কিংবা পাখীর চাইতেও যে সরীসৃপেরই সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ তাহা প্রমাণিত হয়, কিন্তু মায়ের দুধ পান করে বলিয়া উহাদিগকে স্তন্যপায়ী প্রাণীই বলা হইয়া থাকে। ইহারা এক ফুট হইতে একহাত পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। ইহাদের লেজ দেখিতে বিবরের মত। গায়েব বং ঘনকটা এবং চক্ষু দুইটি ছোট। মাথার বাহিরে কাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। চঞ্চুতে দাঁতের স্থানে অস্থিনির্ম্মিত উচু স্থান আছে। অষ্ট্রেলিয়ায় ইচিণ্ডা (Echinda) নামক তাহারই আর একজন জ্ঞাতি ভাই আছে। হংসমুখীর মত তাহার দেহের উপরে রোম নাই কিন্তু সজারুর মত কাঁটা আছে। দেহের নীচের দিকেই শুধু রোম উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিপদ সময়ে ইচিণ্ডার কাঁটাগুলি তাহাদের ইচ্ছামত তাহারা দাঁড়া করিয়া রাখিতে পারে। ইহাব হংসমুখীর মত চঞ্চু থাকে না। ছবিতে যে লম্বা ঠোঁটের মত অংশ তোমরা দেখিতে পাইতেছ, তাহা ইহার নাসিকাই বর্দ্ধিত হইয়া এরূপ চঞ্চুর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাদের মুখেও কোন দাঁত নাই। জিব বেশ লম্বা এবং আটাযুক্ত থাকাতে তাহারা ইহার সাহায্যে তাহাদের খাদ্য, পিপীলিকাগুলি বন্দী করিয়া খাইয়া থাকে। ইহাদের মানুষের মত পাঁচটি অঙ্গুলি আছে। নখগুলি বেশ লম্বা এবং সবল। ইহাদের সাহায্যে তাহারা খুব তাড়াতাড়ি গর্ত্ত খুঁড়িয়া গর্ত্তের ভিতর লুকাইয়া পড়ে। হংসমুখীর মত ইহারাও ডিম্ব প্রসব করে। ইচিণ্ডা তাহার উদরের নীচে থলের ভিতর ডিম রাখিয়া দেয়।



ইচিণ্ডা

সেখানেই ইচিণ্ডার বাচ্চা উৎপন্ন হয় এবং মায়ের দুগ্ধ পান করিয়া বাড়িতে থাকে।

তোমাদের পরিচিত জন্তু কেঙ্গারু, দ্বিতীয় স্তরের স্তন্যপায়ী প্রাণী (marsupials)। হংসমুখীর ন্যায় ইহারাও অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। বর্ত্তমানে ইহাদের যেরূপ আকার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া



কেঙ্গারু

গঠিত হইয়াছে। তাহারা যখন বুঝিতে পারিয়াছিল যে চারিপায়ে দৌড়াইয়া চলার চাইতে, লাফাইয়া চলাতেই আত্মরক্ষার পক্ষে সুবিধা বেশী, তখন হইতে তাহারা সেইরূপেই লাফাইয়া চলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। ইহার ফলে তাহাদের সম্মুখের পাদুটি ক্রমশঃ ছোট হইয়া বর্ত্তমান অবস্থাতে উপনীত. হইয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পাদুইটি ও লেজ, সবিশেষ পুষ্ট ও সবল আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারা ইহাদের লেজের উপর ভর করিয়া অনায়াসে বসিয়া থাকিতে পারে। পিছনের পা এবং লেজের সাহায্যে ইহারা এত জোরে লাফ্ দিতে পারে যে, একাদশ ফিট পর্য্যন্ত উঁচু বেড়া ইহারা অনায়াসে পার হইয়া যায়। ইহাদের মাংস সুখাদ্য এবং চর্ম্মও

খুব মূল্যবান জিনিষ। এই উভয় কারণেই মানুষ ইহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করাতে ইহাদের সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে। কেঙ্গারু যদিও নিরর্থক কাহাকে আক্রমণ করেনা কিন্তু কেহ আক্রমণ করিলে খুব সাহসের পরিচয় দেয় এবং বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া থাকে। শিকারী কুকুর কেঙ্গারুর পিছু নিলে কেঙ্গারু সাধারণতঃ জলে নামিয়া পরে এবং কুকুর কাছে আসিলে সম্মুখের পা দ্বারা জলের নীচে চাপিয়া ধরে তাহাতেই কুকুর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর জলের নিকট পর্য্যন্ত পৌছাইতে না পারিলে, পিছন ফিরিয়া শত্রুকে আক্রমণ করে এবং পিছনের পায়ের নখ্ দ্বারা কুকুরের উদর একেবারে ছিড়িয়া ফেলে।

মাদী কেঙ্গারু বিপদের সময় তাহাদের বাচ্চাগুলি উদরের নীচের থলেতে তাড়াতাড়ি তুলিয়া নেয় এবং পালাইয়া যায়। থলের ভিতরে ছানা থাকার দরুণ দৌড়াইতে অসুবিধা হইলে, মাদী কেঙ্গারু বাচ্চা গুলিকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর মনোযোগ নিজের দিকে আকষণ করিয়া পালাইয়া যায়। তারপর শত্রুর হাত হইতে জীবনরক্ষা পাইলে, ফিরিয়া আসিয়া বাচ্চাগুলিকে তুলিয়া নেয়। এইরূপে শত্রুর হাত হইতে বাচ্চাগুলিকে রক্ষা করিতে গিয়া, মাদী কেঙ্গারু মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়া থাকে।

কেঙ্গারু শ্রেণীর প্রাণী, অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কেঙ্গারুর মত আর কোন প্রাণীই এত বড় হয় না।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্তরের যে সকল প্রাণী আছে তাহাদের সকলেরই ভ্রূণ, ফুল (Placenta) সংযুক্ত। ফুল কাহাকে বলে তাহা হয়ত তোমরা জান না। মাতৃগর্ভে এই সকল প্রাণীর ভ্রূণ যখন বাড়িতে থাকে, তখন এই ফুলের সাহায্যে, ভ্রূণ মাতৃদেহ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। মনুষ্য-শিশুও মাতৃগর্ভে এইরূপ ফুল সংযুক্ত থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে ফুল সংযুক্ত প্রাণীই শুধু ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রাণীর মধ্যে কেঙ্গারু তোমরা কলিকাতা চিড়িয়াখানায় দেখিতে পাইবে।

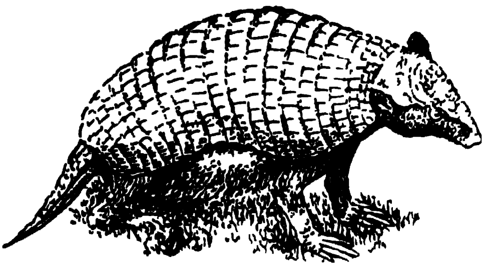
স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে, এই শ্রেণীব প্রাণী আবার বহু রকমের। তাহাদের মধ্যে মাংসাশী (carnivores), ক্ষুর সংযুক্ত (Ungulates) এবং বনমানুষ জাতীয় প্রাণীই প্রধান। ক্ষুরসংযুক্ত প্রাণী সাধারণতঃ ঘাস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে বলিয়া তৃণভোজীও বলা হইয়া থাকে। তৃণভোজী



পেঙ্গুলীন

এবং মাংস ভোজী প্রাণীর আকাবগত পার্থক্যেব কথা পূর্ব্বেও আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে কতকগুলি উদাহরণের দ্বাবা এই জাতীয প্রাণীদিগেব আবার বিশেষ বিশেষ শ্রেণী বিভাগেব কথা বলা হইল।

১। অদন্তা (Edentata)—দক্ষিণ আমেরিকাব জঙ্গলে, পিপীলিকাভুক শল্কসংযুক্ত প্রাণী (Ant eater), শ্লথ (Sloth) এবং আবমাডিলো (Armadillo) নামক প্রাণী আছে। তাহাবাই ইহাদের প্রকৃত উদাহবণ। শল্ক সংযুক্ত পিপীলিকাভুক অর্থাৎ পেঙ্গুলীন, (Pangulin) দন্তহীন। ইহাদের দাঁত থাকে না বলিয়াই শুধু ইহাদিগকেই প্রকৃতপক্ষে দন্তহীন

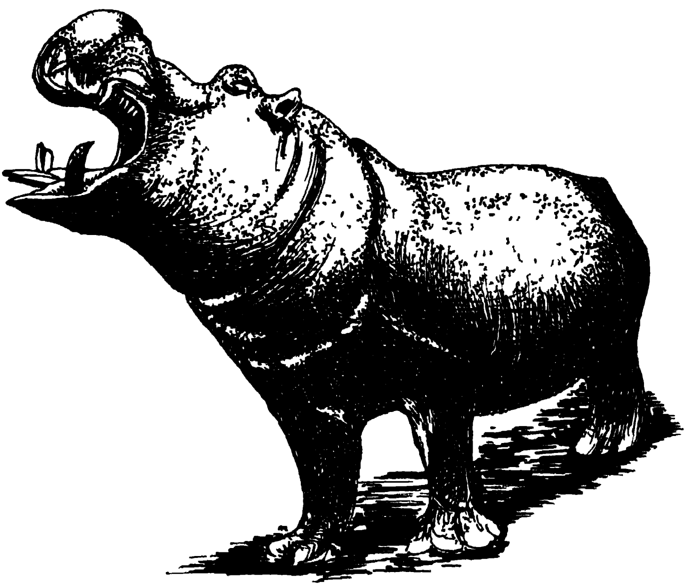


আর্‌মাডিলো

বলা যাইতে পাবে। কিন্তু অধিকাংশ এই শ্রেণীর প্রাণীর মুখে দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আব্‌মাডিলো (Armadillo) বড় সুন্দর রকমের

প্রাণী। ইহা আমেরিকাতে জন্মিযা থাকে। পিঠেব উপব দিকে কচ্ছপেব আবরণের মত কঠিন আববণ আছে। কিন্তু কচ্ছপেব মত ইহা ধীরগামী ত নয়েই বরং খুব তাডাতাড়ি দৌড়াইতে পাবে। আর্মাডিলো মাটিব ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাস করে এবং অপবিষ্কাব পবিত্যক্ত জিনিষই তাহার প্রধান খাদ্য।

২। তোমবা লক্ষ্য করিলেই—ক্ষুর সংযুক্ত পা-বিশিষ্ট এবং উদ্ভিদ-ভোজী স্তন্যপায়ী (Ungulata), কোন কোন প্রাণী যে আকারে খুবই বড হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পাবিবে। তোমাদেব পবিচিত হস্তী, ঘোডা, গণ্ডাব, গরু, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীব যে আকারে কত বড় তাহা তোমবা জান।

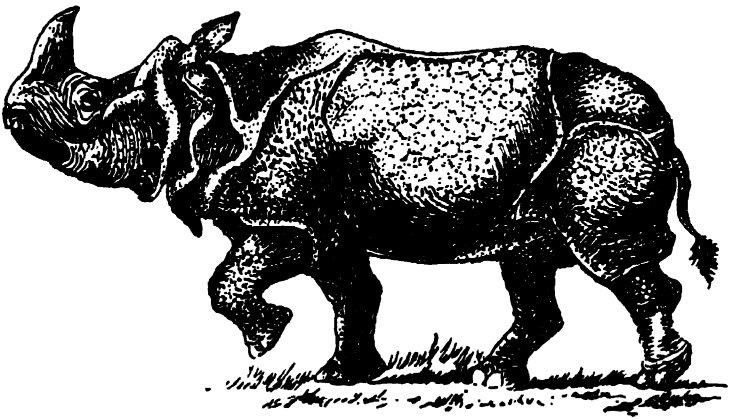


জলহস্তী

এছাড়া ছাগল, ভেড়া, শূকব প্রভৃতি এই শ্রেণীব প্রাণীও, পূর্ব্বোক্ত অদন্তা শ্রেণীর প্রাণী হইতে যে বেশ বড় সে বিষয়ে আব কোন সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে যত রকম অতিকায় জন্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে আফ্রিকার জলহস্তী (Hippopotomus) ছাড়া আর কোন

প্রাণীই জলে বাস করে না। এই জলহস্তী নদী জলেই সচরাচর বাস করিতে দেখা যায়। এই সকল প্রাণীর মধ্যে ক্ষুরের বা নখের সংখ্যা একরূপ নয়। তোমরা একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা দেখিতে পাইবে। ইহাদের মধ্যে ঘোড়ার পায়ে মাত্র একটি ক্ষুর, গণ্ডারের প্রত্যেক পায়ে তিনটি ও হাতীর পায়ে পাঁচটি করিয়া ক্ষুর বা নখ থাকে। এরূপ ক্ষুরের সংখ্যার তারতম্য তোমরা ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ক্ষুর পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পার।

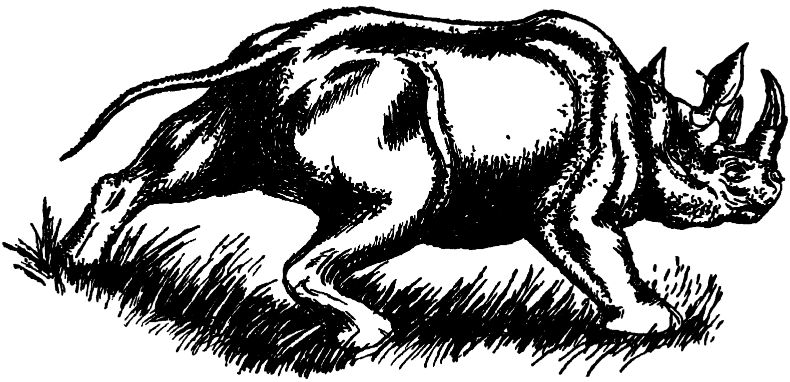
ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে হাতীর অভাব নাই। ইহারা ইহাদের আকার, শক্তি এবং বুদ্ধির জন্য সকল দেশেই পরিচিত। ভারতবর্ষের মত



গণ্ডার

আফ্রিকাতেও বহু হাতী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সম্পূর্ণ তৃণভোজী প্রাণী। আসামের সমতল ভূমিতে বড় বড় ঘাসের বনে গণ্ডার বাস করে। ইহাদের চর্ম্ম বেশ মোটা। ইহারা আবার দুই রকমের। কোন কোন গণ্ডারের নাকের উপর মাত্র একটি খড়্গ থাকে। অন্য জাতীয় গণ্ডারের নাকের উপর একটির স্থানে দুইটি খড়্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের এই খড়্গ যে কি, তাহা শুনিলে তোমারা হয়ত প্রথমতঃ বিশ্বাসই করিতে চাইবে না। ইহা তাহাদের চর্ম্মজ রোম সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই

নহে। আপাততঃ দেখিতে ইহা সম্পূর্ণ হাড়ের মত বলিয়াই বোধ হয়, বাস্তবিক কিন্তু তাহাদেব এই অস্ত্র বহু বোম সমষ্টি একত্রিত হইয়া উৎপন্ন হইযা থাকে। গণ্ডারেব প্রকৃতি সাধাবণতঃ খুবই শান্ত কিন্তু বাগিলে বড



দ্বি-খড়্গ বিশিষ্ট শ্বেত গণ্ডাব

ভীষণ আকাব ধাবণ কবে। জলহস্তীকে (Hippopotamus) একটি অতিকায় জলচর শূকব বলিলেই হয। ইহাবা অনেক সময নদীতে যে সকল ছোট ছোট নৌকা থাকে তাহা আক্রমণ কবিযা ডুবাইযা দেয এবং নৌকাবোহিদিগকে বধ কবিযা ফেলে।

৩। মৎস্য সদৃশ্য জলচব স্তন্যপাযী (Cetacea) প্রাণীব উদাহরণ অতিকায় তিমি, শুশুক, উলুকী (Porpoise) প্রভৃতি প্রাণী। ইহাদেব মধ্যে তিমির কথা তোমবা সকলেই শুনিয়াছ এবং শুশুক হয়ত তোমরা অনেকে দেখিয়াছ। বাদুব যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণী হইয়াও দেখিতে পাখীর মত এবং আকাশেও উড়িযা বেডায ইহাবাও তেমনি স্তন্যপায়ী প্রাণী হইলেও আকাবে অনেকটা মাছের মত এবং জলেব ভিতরেই বাস করিয়া থাকে। কোন কোন অতিকায় তিমি আকাবে একশত ফুটেবও বেশী লম্বা হইতে দেখা যায়। ইহাদেব গায়ের উপর স্তন্যপায়ী প্রাণীব লক্ষণ রোম কখনও উৎপন্ন হয় না। চিংড়ি, কাকড়া, ছোট মৎস্য বিশেষভাবে জেলি মাছ প্রভৃতি

প্রাণী ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহার মস্তবড় লেজ এরূপভাবে দেহের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে যে তাহাতে ইহাদের সাঁতড়াইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। ইহাদের সম্মুখদিকের পাখ্‌না দুইটি সাঁতড়াইবার জন্য দাঁড়ের কাজ

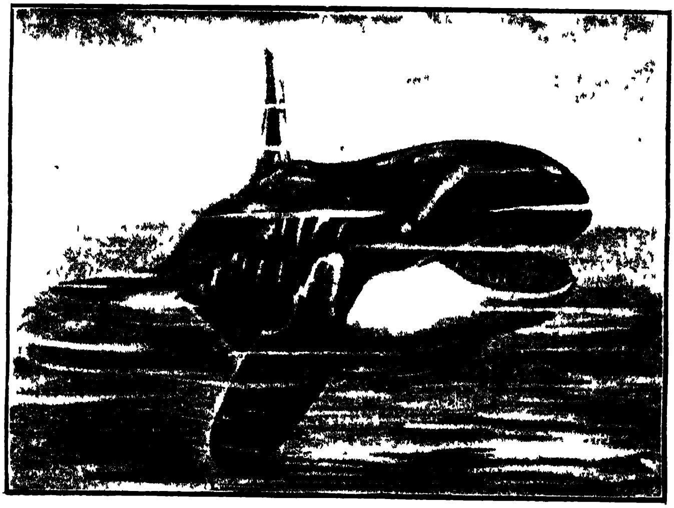


বিশালকায় দন্তহীন তিমি।

করিয়া থাকে। পিছনের পাখ্‌না দুইটি একেবারে লোপ হইয়া যায়। শুশুকগুলি খুব দ্রুতগতিতে সাঁতড়াইতে পারে। মুহূর্ত্ত মধ্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যায় এবং জলের উপর ঘন ঘন ভাসিয়া উঠে।

তিমি জাতীয় প্রাণী যদিও জলে বাস করে তবুও আমাদের মত ইহাদেরও শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে হয়। এজন্য মাঝে মাঝে ইহারা জলের উপর ভাসিয়া উঠে। যদি কোন কারণে জলের উপর মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিতে না পারে তবে শ্বাস বন্ধ হইয়া আমাদের মতই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তিমি মাছের খাদ্য সংগ্রহ প্রাণালীও আবার বড় আশ্চর্য্যজনক। ইহাদের মুখে বহু হাড়ের টুকরা মুখের উপর দিক হইতে ঝুলিতে থাকে, ইহাদিগকেই তিমির হাড় (whale bone) বলে। যদিও তিমি প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আকারে বড়, ইহাদের খাদ্য কিন্তু নেহাৎ ছোট ছোট প্রাণী। জেলি মাছ খাইয়াই ইহারা প্রায় জীবিত থাকে। এতবড় প্রাণীর

পক্ষে দুই চারিটি জেলিমাছ যে কিছুই নহে তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। সহস্র সহস্র জেলিমাছ একবারে খাইতে পাইলে হয়ত বা তাহাদের ক্ষুধার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইতে পারে। এজন্য ইহারা একেবারে এক এক দল জেলিমাছ মুখের ভিতর বন্দী করিয়া ফেলে। তাহাদের মুখের ভিতরকার পূর্ব্বোক্ত হাড়ের জাল তাহাদের খাদ্য ধরিবার ফাঁদ রূপেই তাহারা ব্যবহার করে। যেখানে জেলি মাছ কিংবা ছোট ছোট মাছেরা দল বাঁধিয়া বেড়াইতে থাকে সেখানে তিমি মাছ তাহার বিশাল মুখ বিস্তৃত করিয়া বসিয়া থাকে। স্রোতের টানে এই মাছের দল তাহার মুখেব ভিতর যখন ঢুকিয়া পড়ে, তখন সে তাহার মুখ বন্ধ করিয়া, এই হাড়ের জালের ভিতর দিয়া মুখের দুইধারে জল বাহির করিয়া দেয়। মাছগুলি মুখেব ভিতরেই থাকিয়া



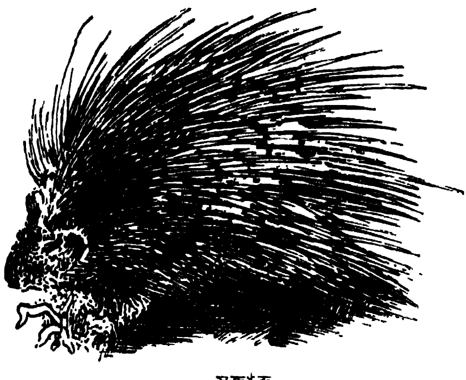
হিংস্র দন্ত সংযুক্ত তিমি।

যায়। এই মাছের দল কোথায় চড়িয়া বেড়ায় তিমি তাহা দেখিতে পারে, হয়ত বা ইহাদের গন্ধেও ইহারা কোথায় আছে তাহা টের পায়। তোমরা হয়ত বলিতে পার যে তিমি এতবড় প্রাণী হইয়াও এত সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী

খাইবার কারণ কি? কারণ এই যে ইহাদের কণ্ঠনলী এত সরু যে তাহার ভিতর দিয়া বড় বড় প্রাণী উদরের ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবার কোন উপায় নাই। এতবড় প্রাণীর এরূপ সরু কণ্ঠনালী বাস্তবিকই একটা আশ্চর্য্যের বিষয়।

তিমি আবার অনেক রকমের আছে। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখে হাড়ের জাল না থাকিয়া, দাঁত থাকে, তাহারা ইহার সাহায্যে প্রাণী বন্দী করিয়া খায়। ইহারা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া থাকে। তিমির তৈল, হাড় প্রভৃতি খুব মূল্যবান জিনিষ বলিয়া লোকে প্রত্যেক বৎসর বহু তিমি বধ করে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তিমি গভীর সমুদ্র জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে বলিয়া আজও আহাদের বংশ একেবারে লোপ হইয়া যায় নাই। আমাদের দেশে সৌখীন লোকে তামাকের সহিত যে সুগন্ধি অম্বরি নামক জিনিষ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা এই তিমি মাছের তৈল পরিষ্কার করিয়াই প্রস্তুত করা হয়।

বহুশত বৎসর পূর্ব্বের তিমির যে সকল প্রস্তরীভূত কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দেখিলে মনে হয় যে সকল তিমিরই পূর্ব্বে দাঁত ছিল। কচি অবস্থায় এখনও সকল রকম তিমিরই মুখে দাঁত থাকে, ইহাও তাহার আরেকটি প্রমাণ।



সজারু

৪। মূষিকাদি যে সকল ছোট ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী দাঁতের সাহায্যে কোন কিছু কাটিয়া থাকে তাহাদিগকে দন্তুর (Rodentia) বলে। ইহাদের মধ্যে কাহারই আকার তেমন বড় নয়। কাঠবিড়ালী, নেংটি ইঁদুর, খরগোস, সজারু প্রভৃতি প্রাণীই ইহাদের উদাহরণ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই রাত্রিচর প্রাণী। সজারুর গায়ের রোমাবলী এই শ্রেণীর অন্যান্য

প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, অর্থাৎ কাঁটাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই কাঁটার সাহায্যেই তাহারা কুকুর প্রভৃতি শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় সকলেই গর্ত্তের ভিতর বাস করে। তাহাদের দাঁতের আকারেও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে, শ্বা-দন্ত বলিয়া কোন ভিন্ন রকমের দন্ত নাই। সুবিধা হইলে দাঁতগুলি তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিও।

এই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে কাঠবিড়ালী প্রায় সকল যায়গাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা বোধ হয় অনেকেই কাঠবিড়ালী দেখিয়াছ। কাঠবিড়ালীর পাখা না থাকিলেও ইহারা এত তাড়াতাড়ি গাছের উপর নীচে উঠা-নামা করে যে, দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা পাখীর মত উড়িতেছে। ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল, গাছের ফল, পাতা ও পাতার কচি কুড়ি খাইয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। তাহারা তাহাদের চামরের মত লেজ উপর দিকে সুন্দরভাবে তুলিয়া রাখে। তাহারা পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া বসে, এবং দুই হাতে খাদ্য তুলিয়া খায়। এ সকল বিষয় তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিও। গাছের উপর কিংবা তলাতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া শীতের জন্য ইহারা খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং শীতকালে খুব ঘুমায়। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ঘুম হইতে জাগিয়া সঞ্চিত খাদ্য খাইয়া পুনরায় ঘুমাইতে দেখা যায়। তাহাদের বাসার নির্ম্মাণপ্রণালী বেশ সুন্দর। প্রত্যেক বাসার সম্মুখে ও নীচের দিকে দুইটি দরজা থাকে। সম্মুখের দরজা দিয়া শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিলে, তাহারা নীচের দিকের দরজা দিয়া পলায়ন করে।



কাঠবিড়ালী

বাঙ্গলা নাম কাঠবিড়ালী হইলেও ইহারা ইন্দুর জাতীয় প্রাণী এবং বিড়াল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ইহারাও বাচ্চা প্রসব করে এবং বাচ্চাগুলি মায়ের দুধ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

৫। কীটভুক্ প্রাণীও (Insectivora)—মুষিক জাতীয় প্রাণীরই মত আকারে ছোট। তোমরা গন্ধমূষিক বা ছুঁছোর কথা অনেকেই শুনিয়াছ। হয়ত কেহ কেহবা দেখিয়াও থাকিবে। ইহাদের শরীরের এবং মলের দুর্গন্ধের জন্যই ইহাদের এই নাম। মুখে সরু ও লম্বা নাক না থাকিলে ইহাদের আকার সম্পূর্ণ মূষিকের মতই হইত। ইহাদের মুখের গর্ত্ত নাকের ডগা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এবং নীচের দিকে। এই লক্ষণ গুলি তোমরা পরীক্ষা করিয়া ইন্দুরের মুখের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে পার।

৬। মাংসাশী প্রাণীব (Carnivora)—কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহারাও যে একটি প্রধান শ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণী বোধ হয় তাহা আর তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না।

৭। বাদুর এবং চামচিকা প্রভৃতি খেচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদিগের (cheiroptera) কথা ইতিপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ইহারা ইহাদের পাখার বিশেষত্বের দরুণই আর একটি ভিন্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

বাদুর এবং চামচিকাকে তোমরা হয়ত অনেকে পাখী বলিয়া মনে করিতে। ইহারা যখন পাখীর মত উড়িতে পারে, তখন তোমাদের এরূপ ভুল হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। তারপর প্রাচীনকালে শত শত বৎসর পর্য্যন্ত মানুষের এরূপ ভ্রান্ত ধারণাই ছিল, সুতরাং তোমাদের আর দোষ কি? স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পক্ষীদেহ পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে বাদুরকে পক্ষী বলিয়া ভুল হওয়ার তোমাদের আর কোন কারণ থাকিতে পারে না। পাখীর মত ঠোঁট কিংবা পালক যে বাদুরের নাই, তাহাও তোমরা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পার।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে বাদুর কিংবা চামচিকা যেরূপ পাখীর ন্যায় উড়িতে পারে, সেরূপ প্রাণী আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের হাতের

গ্রন্থিযুক্ত কঙ্কাল সমধিক দীর্ঘ ও পরস্পব চর্ম্মসংযুক্ত আছে বলিয়াই ইহারা পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইতে পারে। লক্ষ্য করিয়া দেখিও তাহাদের চর্ম্মনির্ম্মিত পাখা নীচের দিকে পায়েব সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বাত্রিকালে ইহাবা খাদ্য অন্বেষণে বাহিব হয় বলিয়া সচবাচর ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া



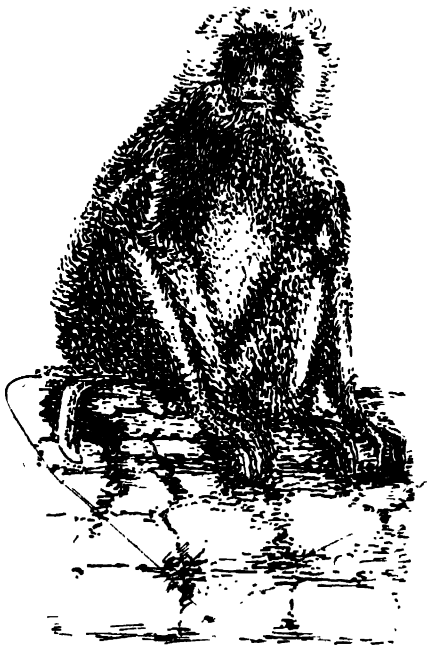
বাদুব

যায় না। দিনেব বেলা রাস্তাব ধাবে জঙ্গলের ভিতবে বাঁশেব ঝোপে, অথবা কোন গাছে, ইহাদিগকে দলে দলে বাস করিতে দেখা যায়। ইহারা সাধাবণতঃ ফল খাইয়া জীবন ধাবণ কবে। চামচিকা পোকা-মাকড়, ইদুব ও ছোট ছোট পাখী ধবিয়া খাইয়া থাকে। ভাম্পায়ার নামক একপ্রকাব বাদুর আছে তাহাবা ছাগল, গরু, এমন কি মানুষেব রক্তও শোষণ করিয়া খায়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদেব দেশে সেরূপ বাদুব দেখিতে পাওয়া যায় না। বাদুবের নাকেব উপর যে চর্ম্ম আছে তাহাব অনুভবশক্তি খুব প্রখর। শুধু ইহারই সাহায্যে ইহারা গন্তব্য স্থানের পথ চিনিয়া লইতে পারে। আমাদের মত ইহাদেরও পাঁচটি পাঁচটি আঙ্গুল আছে, কিন্তু আমাদের সহিত আকাবে ইহাদের যথেষ্ট পার্থক্য। বুড়ো আঙ্গুল খুব খাট এবং নখ পাখীর মত বাঁকান। ইহার সাহায্যে ইহারা গাছের ডালে ঝুলিয়া থাকিতে পারে। ইহাদের রক্ত পাখীর মত গরম। ইহারা বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চাগুলি বুকের দুধ খাইয়া বড় হয়। তোমরা লক্ষ্য করিলেই, বাদুরের ছোট ছোট ছানা যে তাহাদের বুকের উপর ঝুলিতে থাকে, তাহা দেখিতে পাইবে।

৮। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্তরের প্রাণী (Primates), লেমুর, নানা আকারের বানর এবং মানুষের কথাই জীবজগতের শেষ কথা। ইহাদের আকার গত পরস্পর সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাদিগকে একই শ্রেণীর প্রাণী বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। লেমুর এবং বানরজাতী বনচর প্রাণী। ইহারা বনেই বাস করিতে ভালবাসে। দক্ষিণ ভারতেই



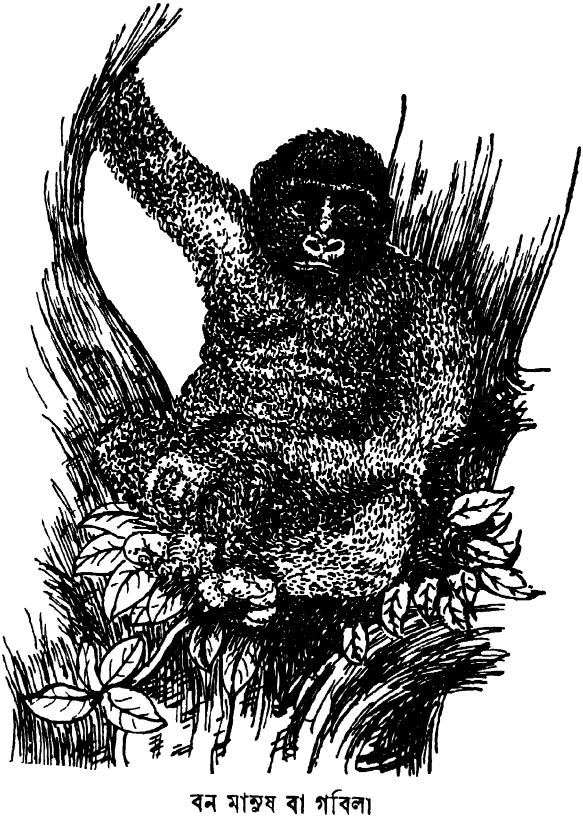
লেমুর



হনুমান

লেমুরের বাস। ইহারা আকারে ছোট কিন্তু তাহাদের কটা রংএর চক্ষু দুইটি বেশ বড়। ইহারা রাত্রিচর প্রাণী, রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায় বলিয়াই বোধহয় চক্ষুও এরূপ বড় হইয়াছে। গাছের ফল এবং নানা রকম পোকাই তাহাদের খাদ্য। দিনের বেলা তাহারা গাছের ডালে তাল পাকাইয়া ঘুমায়। মাদাগাস্কার দ্বীপেই তাহাদের প্রাচীন বাসস্থান। সেখান হইতেই ইহারা অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাদের মস্তিষ্ক, বানর জাতীর মস্তিষ্কের চাইতে খুবই কম পুষ্ট। মুখ খেঁকৃশিয়ালের ন্যায় এবং হাত দুইটি বানরের মত। পণ্ডিতদিগের মতে যতরকম বানর আছে তাহারা সকলেই এই লেমুর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

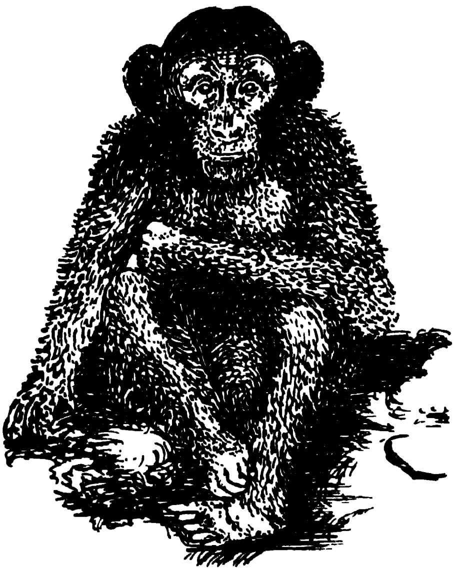
পৃথিবীতে বহু রকমের বানর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের নাকের ছিদ্র দুইটির মাঝখানে একটি সরু পাতলা পর্দ্দা থাকে। তাহারা নানা রকমের খাদ্যই খাইয়া থাকে এবং তাহাদের গাল দুইটি কতকটা থলের মত। খাদ্য সম্মুখে পাইলেই তাহারা তাড়াতাড়ি গালের ভিতর খাদ্য পুরিয়া



বন মানুষ বা গরিলা

রাখে, তারপর সুবিধামত বিশেষরূপ চর্ব্বণ করিয়া গিলিয়া ফেলে। লেমুরের গালে কিন্তু এরূপ কোন থলে থাকে না। গাছের কচি ডগা এবং পাতাই তাহাদের প্রাধান খাদ্য, সুতরাং চর্ব্বনের তেমন দরকার হয় না। **সকল রকম** বানরই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে। বানরের মধ্যে হনুমান, ও

ছোট বড় নানামত বানর তোমরা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় দেখিতে পার। এই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বন মানুষ বা গরিলার কথা তোমরা প্রায় সকলেই শুনিয়াছ। ইহাদের শরীরে, বিশেষতঃ দাঁতে ভয়ানক জোর। ইহারা বন্দুকের নালা কামড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। দাঁত এবং হাতের জোর ও দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির জন্য, জীবন্ত গরিলা ধরা কখনই সম্ভবপর হয় না, এ জন্য ইহাকে সচরাচর দেখিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তোমরা যে গরিলা দেখিতে পাও নাই তাহা তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।



সিম্পাঞ্জি

সিম্পাঞ্জিও গরিলার মত আর একটি শক্তিশালী বানর। গরিলার মত ইহারা তত দুর্দ্দান্ত নহে এজন্য কোন কোন চিড়িয়াখানায় সিম্পাঞ্জি দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় সিম্পাঞ্জিও জীবন্ত ধরা, গরিলার মত অসম্ভব। বাচ্চা সিম্পাঞ্জি ধরিয়া আনিলে পোষমানে এবং গরিলার মত এত সহজে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। গরিলা সহজেই মানুষকে আক্রমণ করে, সিম্পাঞ্জি পালাইয়া যাইবার সুবিধা না পাইলে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। তাহারা উভয়েই আফ্রিকার গভীর বনে বাস করে। সিম্পাঞ্জি কৃষকদিগের বাগান এবং ক্ষেত হইতে ফলমুল চুরি করিয়া নিয়া যায়, এজন্য কৃষকেরা সময় সময় সিম্পাঞ্জি বধ করিয়া ফেলে।

আফ্রিকার বনে আরও নানা রকমের বানর আছে। তাহাদের মধ্যে ঊরাঙ্ উটাঙ্, গিবন, বেবুন এবং মেনড্রিল প্রভৃতি সকলেরই পরিচিত।

ব্রহ্মদেশে মানুষের মত লাঙ্গুলহীন গিবন নামক বানর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পায়ের উপর সম্পূর্ণ ভর রাখিয়া মানুষের মত চলিতে পারে। লম্বা হাত দুইটি কোন কোন সময় মাথার উপর তুলিয়া তাহাদিগকে দৌড়াইতে দেখা যায়। তাহারা শান্ত প্রকৃতির এবং সহজেই পোষ মানে।

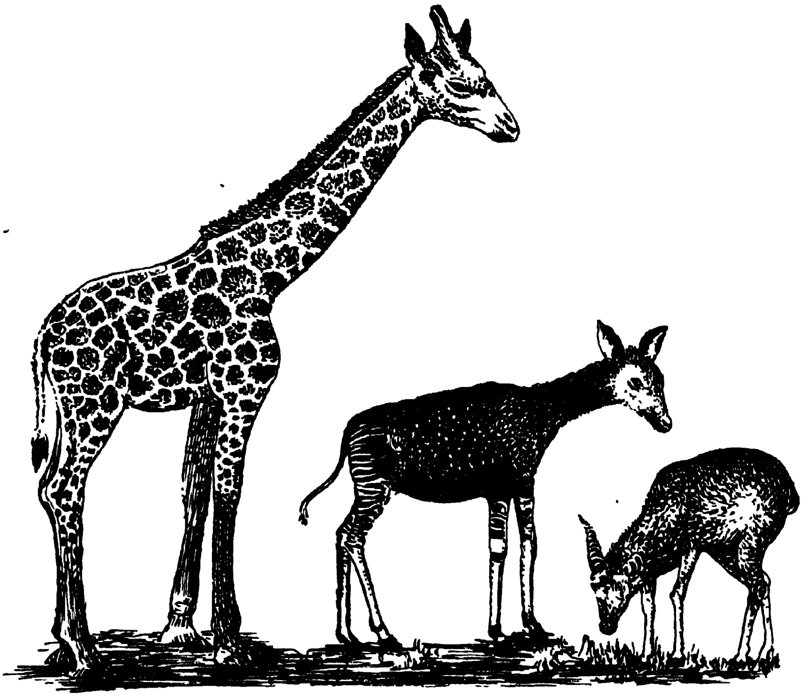
এদের পরেই জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের স্থান এবং পৃথিবীতে যেখানে যে মানুষ আছে তাহারা সকলেই একজাতি। প্রাণী হিসাবে তাহারা সকলেই এক স্তবেব জীব। এইখানেই জীবজগতের শেষ সীমা। মানুষের পর আর কোন উচ্চতর জীব পৃথিবীতে নাই।

মানুষের সঙ্গে, মানুষের নিম্নস্তরের প্রাণী, কোন কোন্ বনমানুষ বা বানরের আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের হাত পায়ের গঠনেব সঙ্গে তাহাদের হাত পায়ের গঠনেরই যা কিছু তফাৎ। তাই বলিয়া মানুষ যে বানর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কিন্তু বলা চলে না। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদিগের মত এই যে মানুষ যে প্রাণী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই প্রাণী হইতে বানরেরও উৎপত্তি হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে, প্রাচীনতম যুগে, এমন একটা প্রাণী ছিল, যাহা হইতে একদিকে যেমন স্ত্রীপুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল তেমনি আবার অন্যদিকে বানরের উৎপত্তি হইয়াছিল। আমাদের এবং সকল দেশেরই ধর্ম্মপুস্তকে উদ্ভিদ, জীবজন্তু এবং মানুষের উৎপত্তির যে বিবরণ লেখা আছে, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, ভগবান ভূমণ্ডল এবং তাহাতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখানে একটি কথা তোমাদিগকে স্মবণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ যাহাদের পরমায়ু মাত্র একশত বৎসর, তাহাদের পক্ষে একদিন দুইদিন সময়েই অল্প সময় বলিয়া মনে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু ভগবান, যাঁহার আদি অন্ত নাই, যিনি অনন্তকাল হইতে আছেন এবং অনন্তকাল থাকিবেন তাঁহার অল্প সময়ের অর্থ লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি বৎসর। মানুষ তাহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে এই কোটি কোটি বৎসরের ভিতর

বহু বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল, একথা বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন। বানরের ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের উৎপত্তি যদিও ধারণা করা যাইতে পারে না, তবুও মস্ত বড় বনমানুষ, গরিলা হইতে ছোট ছোট লেমুর পর্য্যন্ত সকল রকমের বানরেই যে একই প্রাণী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রকৃতি তাহার সন্তান, উদ্ভিদ, জীবজন্তু এমন কি জড় পদার্থ অর্থাৎ যাহা কিছু পৃথিবীতে তোমরা দেখিতে পাও, তাহারা সকলকেই অবিরত ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। এবিষয়ে তাহার তাড়া-হুড়া কিংবা ভুল ভ্রান্তি নাই। প্রথমতঃ জলে শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের জন্ম হইয়াছিল। সেই উদ্ভিদ যেমন তাহার পূর্ব্বাবস্থায় এখনও বর্ত্তমান আছে, তেমনি তাহার ক্রমোন্নতির ফলে, নানা আকারের উন্নততর উদ্ভিদ এবং প্রাণীরও সৃষ্টি হইয়াছে। সৌন্দর্য্যের আধার এনিমোন, যাহাদের কথা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই আদি এই শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ। তারপর ক্রমে ক্রমে পোকা, মাকড়, কীটপতঙ্গ মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পাখী ও নানা আকারের স্তন্যপায়ী যে সকল প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার একটা সাধারণ ধারাবাহিক বিবরণ তোমরা এই পুস্তকে পাঠ করিয়াছ। যদিও পূর্ব্বে আভাষ দেওয়া হইয়াছে, তবুও পুনরায় এখানে বলিয়া রাখিতেছি যে, এখনও বহু প্রাণী লোক চক্ষুর অন্তরালে বর্ত্তমান আছে। দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের প্রাণী, যাহাদের মাঝামাঝি কোন প্রাণী এখনও দেখা যাইতেছেনা, তাহারা হয়ত এখনও মানুষের অজ্ঞাত, অথবা তাহাদের বংশধরগণ পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। ইহাদের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী জগতের ক্রমোন্নতির ধারা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এবিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। লুপ্ত প্রাণীর মধ্যে আর্কিওপটেরিক্সের (Archaeopteryx) নাম এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ইহার আবিষ্কারের

সঙ্গে সঙ্গে সরীসৃপ এবং পাখীর মাঝামাঝি একটি প্রাণী এখন আর শুধু কল্পনার বিষয় নহে। হয়ত এরূপ জীবন্ত প্রাণীও যে না আছে তাহা কে



জেব্রা ওকাপি কৃষ্ণসার

বলিতে পারে ? নবাবিষ্কৃত জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ওকাপি (Okapi) র নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আফ্রিকার জঙ্গলে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ প্রথমতঃ ইহার খবর পান। তখন হইতে ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। ইহারা অত্যন্ত ভীতু এবং লাজুক প্রাণী বলিয়া ইহাদিগকে সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সেইজন্যই বোধ হয় ইহারা এতদিন মানুষের নজরে পরে নাই। ইহার

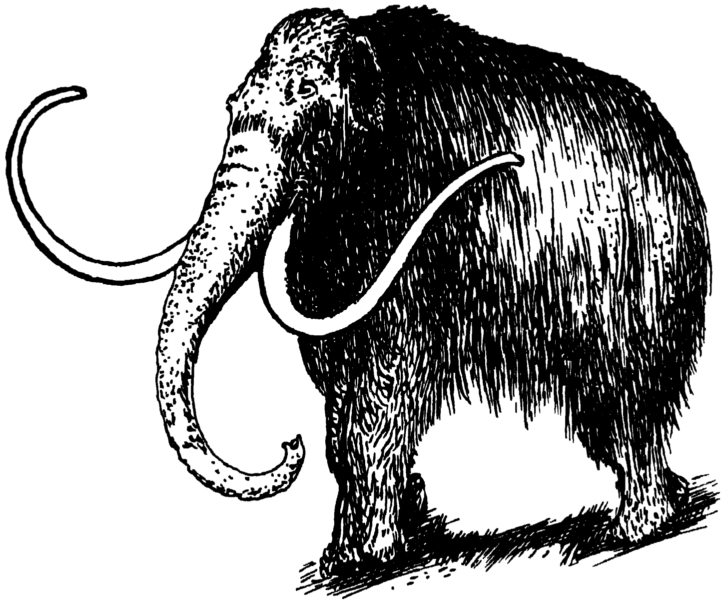
আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লম্বা গলা জিরাফ্ এবং কৃষ্ণসার মৃগের মধ্যে যে বেশ নিকট সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝা যায়। বেশীদিনের কথা নয়, তিব্বতে টেকিন (Takin) নামক একটি নূতন প্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় রক্ষিত আছে। ইহা দেখিতে বেশ বড় এবং



টেকিন

লম্বা শিং বিশিষ্ট। আকারে ইহা কৃষ্ণসার ও গাছলের মাঝামাঝি প্রাণী। সুমেরু প্রদেশে, উত্তর মহাসাগরের তীরে, মেমথ (mammoth) নামক একদল হাতী এখনও বর্ত্তমান আছে বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ যে, অতীত এবং বর্ত্তমানে যে সকল প্রাণী ছিল এবং আছে তাহাদের সকলকেই আজ যদি একত্র করিয়া দেখা সম্ভবপর হইত তবে ক্রমবিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ ধারাবাহিক একটা সূত্র বাহির করা যাইত। কোন্ প্রাণীর পর কোন্ প্রাণীর আবির্ভাব আমরা তাহা পরিষ্কাররূপে বলিতে পারিতাম। বর্ত্তমানেও যে সকল প্রাণী মানুষের

পরিচিত তাহা হইতেও জীবজগতের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক যে একটা পথ আছে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। মাতা প্রকৃতিই জীবজগতে তাঁহার



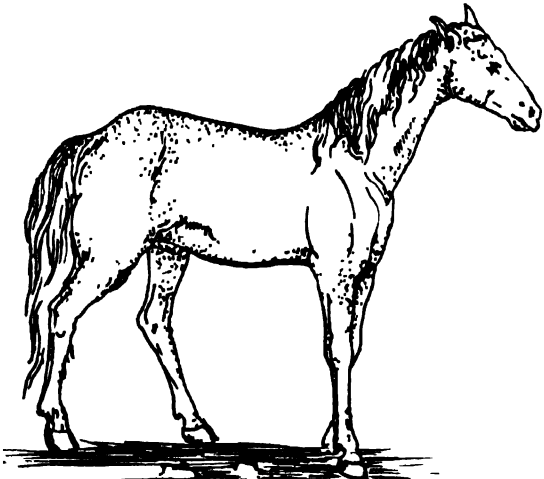
মেমথ

সন্তানগণকে এই ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন। এই ক্রমোন্নতিরই চরম বিকাশ বুদ্ধিমান, সমাজ বদ্ধ, ভাষা বাদী জীব মানব,—আমরা।

সপ্তম অধ্যায়

জীবজগতে সৃষ্টি বৈচিত্র্য

জীবজগতে ভগবানের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কীটাণু কীট হইতে আরম্ভ করিয়া অতিকায় প্রাণী, এমন কি মানুষের জীবনেও এত সব অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটে যাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। এই পুস্তকে তাহার অন্ততঃ একটুকু আভাষ যাহাতে পাইতে পার তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাদের মত শত শত পুস্তকেও

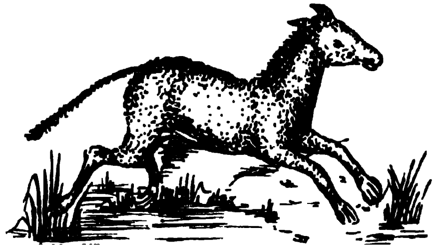


বর্ত্তমান কালের ঘোড়া

জীবজগতের সকল প্রকার বৈচিত্র্যের কথা বর্ণনা করা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। ইহার সাহায্যে জীবজগতের বিষয় আলোচনা করিলে, প্রত্যহ জীবজগতের যে সকল নূতন নূতন বৈচিত্র্য তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে এবং তাহা হইতে তোমরা অতুল আনন্দ

লাভ করিবে। প্রাণী জগতের বৈচিত্র্যসম্বন্ধে আরও দুই একটি কথার আলোচনা করিয়াই এই পুস্তকের উপসংহার করা হইল।

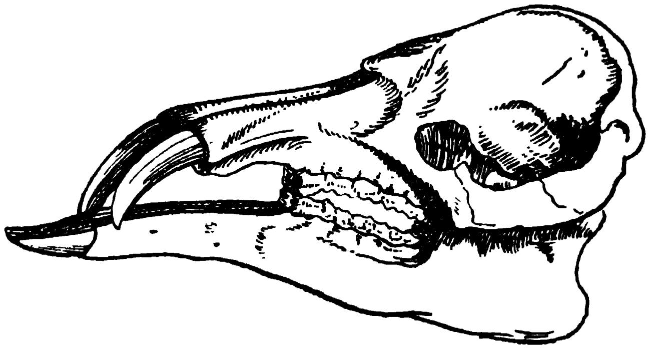
বর্ত্তমানে যে সকল প্রাণী যে আকারের, সচরাচর তোমরা দেখিতে পাও, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের আকার কিরূপ ছিল, ইচ্ছা করিলে তাহাও তোমরা আলোচনা এবং নানারূপ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পার। ইহা যে নিতান্ত সহজ নয় যদিও তাহা সত্য, কিন্তু এরূপ বিবরণ জানার আনন্দও ত নেহাৎ কম নয়। এই যে হাতী ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণী তোমাদের কত রকম কাজে লাগে, বহু শত বৎসর পূর্ব্বে তাহারা দেখিতে কিরূপ ছিল, জানিবার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকিলে, তাহা জানিবার জন্য তোমাদের নিশ্চয়ই প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইবে। জীবজগতের আলোচনার ইহাও একটি পৃথকধারা। ইহার জন্য বহুশত বৎসরের পুরাতন প্রস্তরীভূত প্রাণীর কঙ্কাল ভূগর্ভ হইতে তুলিয়া বিভিন্ন যাদুঘরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিতেরা ইহার সাহায্যে বহুপ্রাণীর পূর্ব্বপুরুষদিগের আকার ও গঠন ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে স্থানে স্থানে পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হইয়াছে।



প্রাচীনতম যুগের ঘোড়া

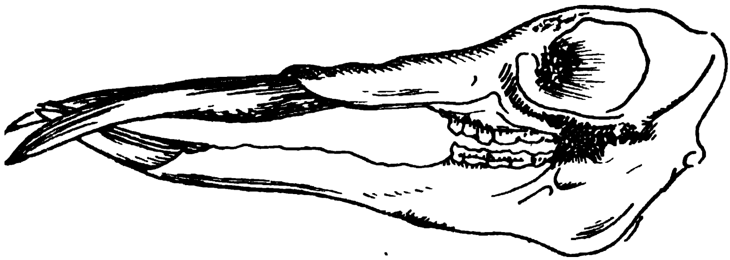
যে ঘোড়াকে বর্ত্তমানে তোমরা অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণী হইতে, বিশেষ ভাবে পায়ের ক্ষুর গঠন বিষয়ে, ভিন্ন রকমের দেখিতে পাও, চিরকালই তাহারা এরূপ ছিল না। এখন তাহাদের পায়ে মাত্র একটি ক্ষুর দেখিতে পাও, বহুশত বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের প্রত্যেক পায়েই পাঁচটি করিয়া ক্ষুর ছিল। তারপর সময়ের পরিবর্ত্তন ও তাহাদের জীবন সংগ্রামের সুবিধার জন্য ক্ষুরের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আজ একটিতেই দাঁড়াইয়াছে। ঘোড়া প্রথমতঃ যখন জলা যায়গায় বাস করিত—তখন তাহা মাত্র একটি সাধারণ

প্রাণী ছিল। আকারে প্রায় খেঁকশিয়ালীর মতই বড় এবং পায়ের আকার কতকটা খরগোসের মত ছিল। নিতান্ত দুর্ব্বল প্রাণী বলিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য জলা যায়গার উপর দিয়া দৌড়াইতে হইত। উটের



ইজিপ্টে প্রাপ্ত হস্তীর পূর্ব্বপুরুষের মাথার কঙ্কাল

বিস্তৃত পা যেমন মরুভূমির বালির উপর দিয়া চলিবার উপযুক্ত গঠনেই গঠিত, তেমনি ঘোড়ারও পা জলা যায়গার পাঁকে যাহাতে সহজে ঢুকিয়া না পরে তাহার জন্যই এরূপ আকারে গঠিত ছিল। তাহাদের এই আকার



ফ্রান্সে প্রাপ্ত হস্তীর মাথার কঙ্কাল

অবশ্য সহস্র সহস্র বৎসরের আগেকার অবস্থা। তারপর ক্রমে শত শত বৎসর যেমন অতীত হইতেছিল, এই ক্ষুদ্র প্রাণীও আবার তেমনি আকারে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গেল। প্রত্যেক পুরুষেই ইহারা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ হইতে ক্রমশঃ পুষ্ট ও সবল হইতে লাগিল। তারপর বর্ত্তমান অবস্থা বহু সহস্র বৎসর পরে প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য

অনববত দৌড়াদৌড়িতে তাহাদের পা ক্রমশঃ দৃঢ় ও সবল আকাব ধাবণ করিল এবং পায়েও ক্ষুর দেখা দিল। তাহাদের পায়ের পাতার অঙ্গুলীগুলি ক্রমশঃ লোপ পাইলে পায়ের মধ্যভাগে মাত্র একটি অঙ্গুলী রহিয়া গেল। ইহা হইতেই তাহাদের ক্ষুরের উৎপত্তি। এখন ভাবিয়া দেখ, যে প্রাণী একদিন প্রায় খেঁকশিয়ালীর মত বড় ছিল আজ তাহা কত বড় এবং কত পরিবর্ত্তিত।

বর্ত্তমানে ভাবতবর্ষে এবং আফ্রিকাতেই শুধু হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদেব বর্ত্তমান আকার হইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগেব আকাব

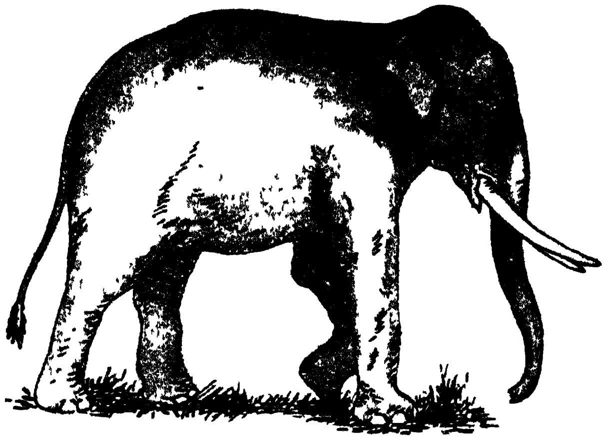


আমেবিকায প্রাপ্ত লুপ্ত বিশালকায় হস্তী মাষ্টডনেব মাথাব কঙ্কাল

আবও কতটা যে পবিবর্ত্তিত ছিল এখন তাহার কথাই আলোচনা কবা হউক। প্রাচীনকালে ইহাদের আকাব আরও বড় ছিল। বর্ত্তমানে নর হাতীর যে দুইটি দাঁত দেখিতে পাও পূর্ব্বে তাহার আকার এরূপ ছিল না। ইজিপ্টের ভূগর্ভ হইতে হাতীব পূর্ব্বপুরুষের যে কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উপরে নীচে দুইটি দুইটি করিয়া চারিটি বড় লম্বা দাঁত ছিল। তারপর ক্রমশঃ শুঁড় বা শুণ্ডের উৎপত্তি হইয়া কতকটা আজকালকার হাতীর আকার ধাবণ করিয়াছিল। ফ্রান্সেও এরূপ চারিটি দাঁত বিশিষ্ট হাতীর কঙ্কাল ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে। ইহাতে ইউরোপেও যে প্রাচীনকালে হাতী ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমেরিকাতে মাষ্টুডন নামক যে

বিশালকায় হাতীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এখনকার হাতীর মত মাত্র দুইটি দাঁত আছে। এই সকল দাঁতের গঠন ও অবস্থান পরীক্ষা করিয়া ইহাও বুঝা যায় যে, হাতীর ছেদন-দন্ত ক্রমশঃ লম্বা হইয়া এইরূপ লম্বা দাঁতের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া সম্মুখের ছয়টি ছেদন-দন্তের মধ্যে হাতীর আর একটিও ছেদন-দন্ত নাই।

ভূগর্ভ হইতে সংগৃহীত প্রাচীন প্রস্তরীভূত যে সকল কঙ্কাল এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সরীসৃপ শ্রেণীর বহু বিশালকায় প্রাণীর

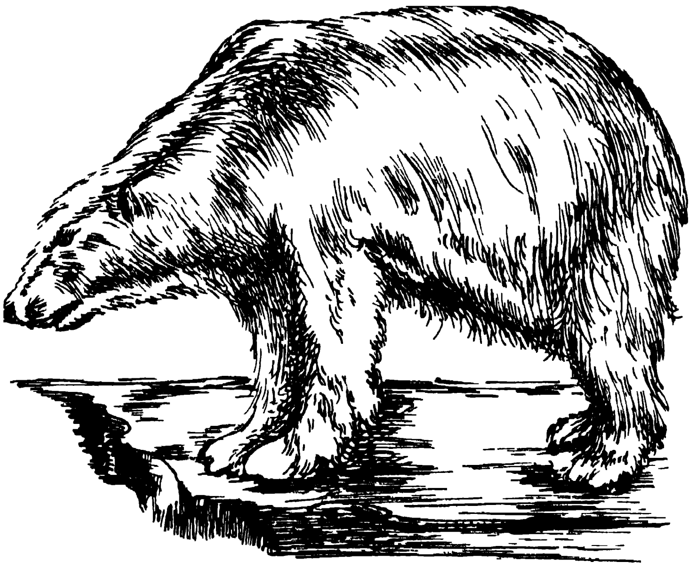


দেশী হাতী (বর্ত্তমান আকার)

কঙ্কালই বেশী। এই সকল প্রাণী বর্ত্তমানে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা রূপকথার দৈত্য দানার চাইতে কোন অংশেই কম ছিল না।

জীবজগতে খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার ব্যাপার আলোচনা করিলে তোমরা আরও অনেক বিস্ময়জনক ব্যাপার দেখিতে পাইবে। অনেক বন্য প্রাণী আছে, যাহারা লুকাইয়া থাকিবার জন্য, চতুর্দ্দিককার উদ্ভিদ ও অন্যান্য জিনিষের রংএর সহিত রং মিশাইয়া এরূপভাবে বসিয়া থাকে যে সহজে তাহাদিগকে কেহই প্রায় দেখিতে পায় না। এ বিষয়ের উদাহরণ তোমরা এই পুস্তকেরই ভিতর অনেক দেখিতে পাইবে। বাঘ একটি বড় জন্তু,

কিন্তু তাহারাও চারিদিককাব রংএর সাথে রং মিলাইয়া, এরূপভাবে বসিয়া থাকে যে সহসা কেহই দেখিতে পায় না। বরফেব দেশের অধীবাসী শ্বেত ভল্লুক সাদা ববফেব সঙ্গে রং মিলাইয়া এরূপভাবে বসিয়া থাকে যে তাহাতে তাহাবা সহজে কোন শিকারীরই নজরে পড়ে না। এছাড়া এবিষয়ে



শ্বেত ভল্লুক

সামান্য কীট হইতে আরম্ভ কবিয়া সকল শ্রেণীব প্রাণীর মধ্যেই কোন না কোন বকম আত্মরক্ষার ও খাদ্য সংগ্রহের একটা পন্থা আছে। এ সকল বিষয় চিন্তা করিলে জীব জগতে বৈচিত্রের উদাহরণেব অন্ত নাই।

জীবজগতে ভগবানের এই সকল সৃষ্টি বৈচিত্রের সৌন্দর্য্য সম্যক যে বুঝিতে পারে তাহাব যে আনন্দ লাভ হয়, তাহার আর তুলনা হয় না। তোমবা সেই আনন্দ লাভ কর, তাহা হইলেই সকল রকমের চেষ্টা এবং পরিশ্রম স্বার্থক হইল বলিয়া মনে করিব।


শেষ